বন্ধনহীন

দস্যু বনহুর

রোমেনা আফাজ

প্রকাশক ঃ
মোঃ মোকসেদ আলী
সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলা বাজার
ঢাকা-১১০০।

গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণে প্রকাশক

নতুন সংস্করণ ঃ অক্টোবর ১৯৯৭ ইং

মূল্য ঃ ৩০·০০ টাকা মাত্র।

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
বিশ্বাস কম্পিউটার্স
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

মুদ্রণে ঃ
সালমা আর্ট প্রেস
৭১/১ বি, কে, দাস রোড
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০।

উৎসর্গ

আমার প্রাণ প্রিয় স্বামী, যিনি আমার লেখনীর উৎসাহ ও প্রেরনা জুগিয়েছেন আল্লাহ রাব্বিল আলামিনের কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করছি।

রোমেনা আফাজ
জলেশ্বরী তলা
বগুড়া

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

দস্যু বনহুর! ভয়ার্ত অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলো শ্যালন।

অন্ধকারে যদিও শ্যালনের মুখমণ্ডল স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো না, তবু বুঝতে পারলো বনহুর, শ্যালন এ নাম শুনে ভীষণ আতঙ্কে শিউরে উঠেছে। বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে তার ভয়-বিহ্বলকাতর মুখ। হেসে বললো বনহুর-হাঁ দস্যু বনহুর। কিন্তু সে তোমার হিতৈষী বন্ধু।

নিকষ অন্ধকারে কম্পিত কণ্ঠস্বর শ্যালনের —কিন্তু---

বনহুর ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায় শ্যালনের পাশে —কোনো কিন্তু নেই; আমাকে তুমি বিশ্বাস করো। শ্যালন, বাংলাদেশে আমার পরিচয় কেউ জানে না। শুধুমাত্র তুমিই জানলে আমি কে? আমার বিশ্বাস, তুমি কাউকে আমার পরিচয় জানাবে না।

আবার প্রতিধ্বনি করলো শ্যালন—আলম!

এবার বনহুরের কণ্ঠে এক বিরহ বেদনা-বিধুর সুর—শ্যালন, এ বাংলা দেশে আমার কেউ নেই—বন্ধনহীন আমি।

স্তব্ধ হয়ে গেলো বনহুরের কণ্ঠ।

শ্যালনের মুখেও কোনো কথা নেই।

নিমতলা শ্মশানঘাটের উন্মত্ত বাতাস তখন সাঁ সাঁ করে বইছে। অদূরে ভয়ঙ্করী রূপধারিনী কলস্রোতা গঙ্গা। তারাবিহীন জমকালো আকাশ।

শ্যালনের কাঁধে হাত রাখলো বনহুর —কি ভাবছো?

চমকে উঠলো শ্যালন।

হাসলো বনহুর—ভয় পেয়েছো?

জমাট অন্ধকারে বনহুরের মুখে তাকালো শ্যালন, কিন্তু কোনো জবাব দিতে পারলো না।

বনহুর বললো—চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

যন্ত্রচালিতের মত অগ্রসর হলো শ্যালন।

গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ালো উভয়ে। বনহুর গাড়ির দরজা খুলে ধরলো—ওঠো!

বিনা বাক্যে ড্রাইভিং আসনের পাশে সীটে উঠে বসলো শ্যালন জড়পুতুলের মত নিশ্চুপ হয়ে।

ড্রাইভিং আসনে বসে ষ্টার্ট দিলো বনহুর। গাড়ি ছুটতে শুরু করলো।

জনহীন রাজপথ।

পথের দু'ধারে লাইট-পোষ্টগুলো নীরব প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে, কর্তব্যের আদেশে যেন গেড়ে গেছে পা' গুলো।

কচিৎ দু'একটা গাড়ি দেখা যাচ্ছে, ছুটে চলে যাচ্ছে বনহুরের গাড়িখানার পাশ কাটিয়ে।

নিশ্চুপ গাড়ি চালিয়ে চলেছে বনহুর।

পাশে জড় পদার্থের মত বসে আছে শ্যালন।

বনহুরের দৃষ্টি সম্মুখপথে।

হঠাৎ বললো বনহুর এক সময়— এমন চুপ মেরে গেলে কেনো শ্যালন? গাড়ি এখন নিমতলা শ্মশান ঘাট ছেড়ে অনেক দূরে এসে পড়েছে, ভয় নেই তোমার।

শ্যালন তবু নীরব, বনহুরের কথায় সে কোনো জবাব দেয় না। যেমন বসেছিলো তেমনি রয়েছে।

বনহুর একবার ফিরে তাকিয়ে দেখে নেয় শ্যালনকে, বলে —শ্যালন, মাণিকের মোহে, না দস্যু বনহুর নাম শ্রবণে তুমি নির্বাক হয়ে গেলে। কই, কোন কথাই তো তুমি বলছো না?

বনহুরের চিন্তাধারা মিথ্যা নয়। শ্যালনকে আজ দুটো ব্যাপারই স্তব্ধ করে দিয়েছিলো। একটি হলো অমূল্য সম্পদ মাণিক হাতে পেয়েও তুচ্ছ সামান্য বস্তুর মত গঙ্গার বুকে বিসর্জন দিয়েছে আলম আর একটি হলো আলম সাধারণ মানুষ নয়—সে? বিশ্ববিখ্যাত দস্যু। যে দস্যুর নামে পৃথিবীর সমস্ত দেশ আতঙ্কে আতঙ্কিত। সে বিশ্ববিখ্যাত দস্যু বনহুর তার পাশে উপবিষ্ট। শ্যালন যেন নিজ কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না। সে বাস্তব জগতে আছে না কল্পনার জগতে—নিজেই যেন ভেবে পাচ্ছে না। দস্যু বনহুর যে স্বাভাবিক মানুষ—এ যেন তার চিন্তাধারার বাইরে।

এতদিন শ্যালনের মনে দস্যু বনহুর সম্বন্ধে একটা ভয়ঙ্কর কঠিন বিদঘুটে চেহারার প্রতিচ্ছবি আঁকা হয়েছিলো। দস্যু বনহুর নাম শুনলে শিউরে উঠতো সে। ঈশ্বর নাম স্মরণ করতো সে তখন। আর আজ সে দস্যু বনহুর তার পাশে--কত বড় হৃদয় হলে সে মাণিকের মত অমূল্য সম্পদকে সামান্য তুচ্ছ জিনিসের মত ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে। আর কত বড় নির্ভীক প্রাণ হলে সে এ গভীর রাতের অন্ধকারে নিমতলা শ্মশান ঘাটের অসংখ্য কঙ্কালের স্তুপের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ত মনে কথাবার্তা বলতে পারে-- কৃতজ্ঞতা আর অফুরন্ত শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে শ্যালনের মাথাটা।

বনহুর বলে—বেশ, কথা না বললে—বুঝতে পেরেছি আমার উপর ঘৃণায় মন তোমার বিষিয়ে উঠেছে।

এতক্ষণে শ্যালন আড় নয়নে তাকালো একবার বনহুরের মুখের দিকে। লাইট-পোষ্টের বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মি চলন্ত গাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে মাঝে মাঝে আলোকিত করে তুলছিলো গাড়ির ভিতরটা। শ্যালন দেখলো দস্যু বনহুর রূপে আলমকে। সুন্দর বলিষ্ঠ একটা পুরুষ-মুখ তার মনকে পুলকিত করে তুললো। এবার সে কথা বললো—দস্যু হলেও তুমি আমার প্রাণরক্ষক।

একটা হাসির রেখা ফুটে উঠলো বনহুরের ঠোঁটের কোণে। দৃষ্টি তার গাড়ির সম্মুখে সীমাবদ্ধ, বললো সে—তা না হলে তুমি আমায় ঘৃণা করতে?

কোনো কথা বলে না শ্যালন।

বনহুর আবার বললো—শ্যালন, দস্যু আমি নই, দস্যুতা আমার পেশা নয়।

তাহলে তুমি দস্যুতা করো কেন?

জানি এ প্রশ্নই তুমি আমাকে করবে। শ্যালন, শুধু তুমি নও, এ প্রশ্নের জবাব আমাকে অনেকের কাছেই দিতে হয়েছে। কেন আমি দস্যুতা করি, তাই না? চুপ রইলে কেন, জবাব দাও?

ভয় পাচ্ছো, তাই না?

শ্যালন কেমন যেন বোবা বনে গেছে।

বনহুর বললো আবার—শ্যালন, আজ কতদিন হলো আমরা বাংলাদেশে এসেছি বলতে পারো?

৭ই জুন সকাল বেলা আমরা ডায়মণ্ড হারবারে এসে পৌঁছেছি।

আর আজ ২৩ শে আগষ্ট—তিনমাস হতে চলেছে তাই না?

হ্যাঁ।

এতিন মাসব্যাপী আমি শুধু তোমার বাবার হত্যা রহস্য উদ্ঘাটনেই ব্যস্ত ছিলাম না। অবসর মুহূর্তে আমি চষে ফিরেছি সমস্ত কলকাতা শহর। কলকাতায় বাস করেও অনেকে যা জানেনা বা দেখেনি। আমি তাই জেনেছি আর দেখেছি। শুনেছিলাম বাংলাদেশ সোনার দেশ। এখানের মাটিতে নাকি সোনা ফলে। শস্য-শ্যামলা জননীরূপী বাংলাদেশ। আর আমি কি দেখলাম জানো?

শ্যালন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে বনহুরের মুখের দিকে, নিষ্পলক নয়নে বাকহীন চিত্রাপিতের মত।

বনহুর গাড়ি চালিয়ে চলেছে, ফাঁকা জনশূন্য পথ। এ-পথ সে-পথ করে আপন মনে গাড়ি ছুটছে, কোনো স্থিরতা নেই গন্তব্যস্থলের। এ তিন মাসের মধ্যে শ্যালনকে যেন আজ সে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠরূপে পাশে পেয়েছে। জনমূখর কলকাতা নগরীর বুকে বনহুর হাঁপিয়ে পড়েছিলো। এতো লোকের মাঝেও সে নিজেকে একান্ত একা মনে করেছিলো। আজ শ্যালনকে পাশে পেয়ে

বনহুর যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। অন্তরের মধ্যে যে কথাগুলো এতদিন বেদনার দানার মত স্তরে স্তরে জমাট বেঁধে উঠেছিলো, আজ যেন খসে পড়লো একজন শ্রোতা পেয়ে। শ্যালনকে বনহুর ভালবাসে; অন্তর দিয়ে স্নেহ করে—কুৎসিৎ লালসাপূর্ণ মন নিয়ে নয়! মানুষ যেমন ফুল ভালবাসে, তেমনি শ্যালন বনহুরের কঠিন পুরুষ প্রাণে এক অভিনব আনন্দ দেয়।

ফুলের পরশে, ফুলের গন্ধে মানুষ নবজীবন লাভ করে। বনহুর শ্যালনের মধ্যে খুঁজে পায় তার অতৃপ্ত হৃদয়ের এক মধুর আস্বাদ। আজ শ্যালনকে পেয়ে বনহুর মুখর হয়ে উঠে, বলে সে মনের কথা।

ডালহৌসী স্কোয়ার রোড ধরে বনহুরের গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছিলো সেক্রেটারিয়েটের দিকে। প্রশস্ত পীচঢালা মসৃণ পথ। গভীর রাতের নিস্তব্ধতা পথের নির্জনতাকে আরও ভাবময় করে তুলেছিলো।

বনহুর বললো—দেখলাম এ দেশের আসল রূপ। মাটিতে সোনা ফললেও কোনো অদৃশ্য হস্তের স্পর্শে সোনা পাথর বনে যায়। শস্য-শ্যামলা জননীর বুকের রক্তই শুধু শুষে নেয় না মানুষ রূপী এ জানোয়ারের দল-এরা বাংলার মানুষগুলোর বুকের পাঁজর গুড়িয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়।

আলম এসব তুমি কি বলছো?

সত্যি শ্যালন, এ তিন মাস ব্যাপী আমি বাংলার যে রূপ দেখলাম, সে অতি ভয়ঙ্করী রূপ। এখানে যারা মানুষ তারাই মানুষরূপী শয়তান। তারাই আসল মানুষগুলোর হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভক্ষণ করে। ভক্ষণ করে তাদের দেহের মাংস। প্রতিটি রক্তবিন্দু নেয় শুষে। রাক্ষসের চেয়েও নৃশংস এরা এ মানুষনামী ভদ্র মুখোসধারীর দল।

বনহুরের কথাগুলো চলন্ত গাড়ির মধ্যে আগুনের টুকরার মত খণ্ড খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিলো। অবাক চোখে তাকিয়ে আছে শ্যালন তার মুখের দিকে।

বনহুর গাড়ি চালাচ্ছিলো, কিন্তু মনের দৃষ্টি তার কোনো অজানার দিকে ছুটে চলছে।

বনহুর বলে চলে—যাদের অস্থি-পাঁজর চূর্ণ করে দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে গড়ে উঠেছে মানুষনামী প্রাণীদের বেঁচে থাকার চলার পথ, তারাই আজ নিষ্পেষিত নির্যাতিত গৃহহীন সম্বলহীন—ফুটপাতে তাদের আশ্রয়স্থল--

বনহুর যেন হাঁপিয়ে উঠে কিছুক্ষণের জন্য থেমে যায়। আবার বলে সে—তিনতলায় বাস করে মানুষনামী প্রাণীগুলো পান করে সুধা আর ওদেরই উচ্ছিষ্ট নিকৃষ্ট পদার্থগুলো নিয়ে ডাষ্টবিনের চারপাশে কাড়াকাড়ি করে কঙ্কালসার জড়াগ্রস্ত নিঃসম্বল অসহায় মানুষের দল। যাদের দেহের রক্তের মূল্যে বাংলার এতো মান।

একটু থামলো বনহুর; তারপর বললো—চেয়ে দেখো শ্যালন, ঐ যে পথের দু'ধারে রাজপ্রাসাদ সম অট্টালিকাগুলো দেখছো এগুলো কাদের জান? কাদের হৃদয় নিংড়ানো প্রচেষ্টা দিয়ে গড়ে উঠেছে এ সব ইমারৎ ? আংগুল দিয়ে দেখালো বনহুর ফুটপাতের দিকে—ঐ যে যারা পথের ধুলায় কুকড়ে পড়ে আছে, ওদেরই বুকের পঞ্জর গুড়িয়ে গড়ে উঠেছে এসব বালাখানা। আজ ওরা নিঃসহায়, অসহায়, আশ্রয়হীন। রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ে নেই এতোটুকু মাথা গুঁজবার ঠাঁই। ক্ষুধায় নেই এক মুষ্ঠি খাবার। ডাষ্টবিনের মধ্যে যারা খাবারের সন্ধান করে ফেরে। যাদের লজ্জা নিবারণের জন্য নেই এক খণ্ড বস্ত্র। শ্যালন, বলো—বলো তুমি--একটাই কি আমাদের ভদ্রবেশি মানুষ নামী জীবনগুলোর সমাজের প্রতি ন্যয়বিচার?

আলম, তুমি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছো, যেভাবে গাড়ি চালাচ্ছো তাতে এক্সিডেন্ট না হয়ে বসে!

হেসে উঠলো বনহুর— ধনবান দুহিতা তুমি! জীবনের মায়া তোমাদের বেশি।

শ্যালন এবার অনেকখানি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, বলে সে —আলম, তুমি নাকি দস্যু কিন্তু এতো কোমল, এতো মায়াভরা তোমার প্রাণ!

হাসালে শ্যালন! আমি তোমাকে বড্ড অবুঝ ভাবতাম—কিন্তু আসলে তুমি অবুঝ নও।

আলম!

হাঁ, এবার চলো তোমাকে বাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে আসি।

আমাকে নিয়ে এতোক্ষণ এভাবে ঘোরার কি মানে হলো বলো তো?

আবার তুমি ছেলেমানুষের মত কথা বললে শ্যালন। কত দিন পর তোমাকে একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছিলাম, তাই তোমাকে ছাড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না।

তুমি যেখানে থাকো নিয়ে চলো আমাকে।

তা হয়না শ্যালন, তা হয় না—

কেন হয় না?

আমি দস্যু ডাকু কিন্তু শয়তান নই।

শ্যালন আর কোনো কথা বলতে পারে না, নিশ্চুপ বসে থাকে।

বনহুরের গাড়িখানা এবার সোজা পার্ক সার্কাস অভিমুখে ছুটতে শুরু করে।

❑

শ্যালনকে পৌঁছে দিয়ে বনহুর যখন ক্যালকাটা গ্র্যাণ্ড-হোটেলে ফিরে আসে তখন ভোরের আকাশে সুর্য উঁকি দিচ্ছে।

বয় মিঠু ছুটে এলো, ব্যস্তকণ্ঠে বললো সে—স্যার, গোটা রাত কোথায় ছিলেন?

বনহুর কোট-টাই খুলে মিঠুর হাতে দিয়ে বললো—কেন, আমার জন্য খুব বুঝি ভেবেছিলি?

হাঁ স্যার।

কেন? কলকাতা শহরে হারিয়ে যাবো, তাই?

স্যার ঠিক তা নয়, তবে কলকাতা শহর—সব সময় এক্সিডেন্ট লেগেই আছে কিনা।

বনহুর বুঝলো, মিঠু তাকে এ ক'দিনের মধ্যে অনেকখানি ভালবেসে ফেলেছে। হেসে বললো সে—ভয় নেই মিঠু, ফিরতে বিলম্ব হলে আমার জন্য চিন্তা করিসনে। আমার কাজ যে রাতেই।

অবাক হয়ে মিঠু—রাতে! সে কি রকম কাজ স্যার? লোকে কাজ করে দিনে—যত অফিস, আদালত, কাচারী, দোকানপাট---

মিঠুর কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠে বনহুর—সব দিনে, হয়, তাই না?

হাঁ স্যার?

কিন্তু আমার অফিস রাতে।

কি কাজ করতে হয় স্যার আপনাকে?

বনহুর গম্ভীর হয়ে পড়ে, ছোকরা বড় চালাক—কোনো গোয়েন্দা দলের লোক নাকি? এতো কথা জিজ্ঞাসার মানে কি? বনহুর বললো—আমার নাস্তা নিয়ে আয়। আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসছি। ওঃ কি কাজ করতে হয় জানতে চাস্ না?

হাঁ স্যার? শুনলে আমার মনটা নিশ্চিন্ত থাকবে।

হেসে বললো বনহুর—রাতে শহরে আমাকে ডিউটি দিতে হয়— মানে পাহারা দিতে হয়, বুঝলি?

সেতো পুলিশ আর চৌকিদারের কাজ, আপনি তো ভদ্রলোক।

আমি ভদ্রলোক, তাই ভদ্র-সন্তানদের ঘরে পাহারা দিতে হয়।

ওঃ বুঝেছি। সাহেবদের বাড়ি!

হাঁ। এবার চলে যা, চট্ পট্ যা হয় খাবার এনে দে। খেয়ে ঘুমাবো, বুঝলি?

আচ্ছা স্যার।

মিঠু চলে যায়।

বনহুর বাথরুমে প্রবেশ করে।

❑

আলবার্ড মুক্তিলাভ করে ফিরে আসার পর তিনি তাঁর পরম আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে একটা আনন্দ-উৎসবের আয়োজন করলেন। কলকাতার বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ এ উৎসবে বাদ পড়লেন না। বিশেষ করে ধনী ব্যবসায়ী মার্চেন্ট-প্রিন্সগণ এ উৎসবে সর্বশ্রেষ্ঠ অতিথির আসন গ্রহণ করলেন।

পার্ক-সার্কাস রোডের মোড়ে আলবার্ডের হোয়াইট ওয়াশ করা বিরাট বাড়িখানার সম্মুখভাগে অসংখ্য প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে আছে।

আর একখানা কার এসে থামলো গাড়িগুলোর পাশে। মডেল পন্টিয়াক গাড়ি। গাড়ির মধ্যে হতে নেমে এলেন এক প্রৌঢ় ভদ্র লোক-মার্চেন্ট প্রিন্স অভয়কর বিশ্বাস। কলকাতায় তার বিশ্বাস কোম্পানী নামে অনেকগুলো কারবার আছে।

আলবার্ডের বিশেষ একজন বন্ধুস্থানীয় লোক এ অভয়কর বিশ্বাস। আলবার্ড বিশ্বাস কোম্পানীর কয়েকটি কারবারের সঙ্গে জড়িত আছেন। এ কারণেও অভয়করকে তিনি বেশ সমীহ করে চলেন।

বিরাটা হলঘর মার্চেন্ট প্রিন্স মহোদয়গণের আগমনে জমকালো হয়ে উঠেছে। টেবিলে-টেবিলে নানারকম খাদ্যসম্ভার থরে থরে সাজানো। সুস্বাদু পানীয় বস্তুর অভাব নেই।

একপাশে উঁচু একটা স্থানে পিয়ানোবাদক ও অন্যান্য বাদ্যকরগণ বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বসেছে। পিয়ানোর টুং টুাং শব্দ কক্ষমধ্যে এক মোহময় পরিবেশের সৃষ্টি করে চলেছে।

রাত বেশি নয়—সবে মাত্র আটটা।

কক্ষমধ্যে উজ্জ্বল নীলাভো আলো পরিবেশটাকে আরও মধুময় করে তুলেছিলো।

পিয়ানোর টুং টাং আওয়াজের সঙ্গে মার্চেন্টপ্রিন্সগণের হস্তে ছুরি-কাঁটা-চামচের শব্দ আর তাঁদের হাসি-গল্পের লহরী মিলে অদ্ভুত এক সুরের সৃষ্টি হচ্ছিলো।

শুধু পুরুষকণ্ঠের হাস্যধ্বনিই নয়, নারীকণ্ঠের উচ্ছল কলকণ্ঠ মাতিয়ে তুলেছিলো কক্ষটাকে।

মিসেস আলবার্ডও যোগ দিয়েছেন মেয়েদের মধ্যে।

শ্যালনও এ আসরে বাদ পড়েনি।

ওদিকের একটা সোফায় বসে আছে চুপচাপ। উজ্জ্বল নীলাভো আলো তার সোনালী চুলগুলোকে নীলচে করে তুলেছে। শুভ্র গাউনের উপর জড়িয়ে বুটি করা ফুলগুলো ঝক্‌মক্ করছে আলোক রশ্মিতে। অপূর্ব সুন্দর লাগছে আজ শ্যালনকে।

শ্যালন নিশ্চুপ বসেছিলো তার টেবিলের পাশে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো সে এ সব।

পিয়ানোবাদক মাসুদ ইরানীর হস্তে অপূর্ব সুরের ঝঙ্কার উঠেছে। সমস্ত কক্ষটা যেন সুরের মূর্ছনায় খান খান হয়ে পড়েছে। এমন সুর তারা ইতিপূর্বে কোথাও শোনেনি।

আনন্দে আপ্লুত সবাই।

সকলের হৃদয়েই একটা সুরের মুর্ছনা।

হঠাৎ অভয়কর আলবার্ডের দিকে তাকিয়ে কিছু ইংগিত করলেন।

আলবার্ড উঠে গেলেন শ্যালনের পাশে, কি যেন ফিস ফিস করে বললেন।

শ্যালনের মুখ গম্ভীর হলো।

একটু পরে অভয়কর স্বয়ং উঠে গেলেন শ্যালনের পাশে। হাতে তার কাঁচপাত্র ; কি যেন বলে কাঁচপাত্রটা বাড়িয়ে ধরলেন শ্যালনের দিকে।

শ্যালন কাঁচপাত্রটা গ্রহণ না করে আসন ত্যাগ করলো এবং চলে গেলো পাশের কামরায়।

অভয়কর ফিরে এলেন নিজ আসনে, আলবার্ডের সঙ্গে একবার দৃষ্টি বিনিময় হলো তার।

মাসুদ ইরানীর হস্তে পিয়ানোটা মুহূর্তের জন্য থেমে গেলো। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মাসুদ ইরানী নিজেকে সামলে নিলো অতি সাবধানে।

❑

আনন্দোৎসব শেষ হলো রাত বারোটায়।

আলবার্ড স্বয়ং সম্মানিত অতিথিগণকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে গাড়িতে উঠিয়ে দিচ্ছিলেন।

অভয়কর বিশ্বাস এবার বিদায় চাইলেন, তখন আর একবার আলবার্ডের মুখে তাকিয়ে চাপাকণ্ঠে কিছু বললেন।

আলবার্ডের মুখে হাসি ফুটলেও সে হাসি যেন নিরস আনন্দহীন মনে হলো।

অভয়কর গাড়িতে বসে হাত নাড়লেন।

আলবার্ডের মুখ তখন কালো হয়ে উঠেছে।

সবগুলো গাড়ি যখন এক এক করে বিদায় নিয়ে চলে গেলো, তখন আলবার্ড অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

আর্থার এসে দাঁড়ালো তাঁর সামনে—বাবা, এ তোমার অন্যায়।

জানি কিন্তু কোনো উপায় নেই! অভয়কর বিশ্বাস আমার কাছে এখনও কোটি টাকা পায়।

তাই বলে ঐ শয়তান লোকটার কাছে শ্যালনের মত নিরীহ একটি মেয়েকে--না না এ হতে পারে না বাবা। এ হতে পারে না--

আর্থার, তুমি আমার সব কথা জানো না। অভয়কর আমার বন্ধু হলেও আমি তার কাছে সর্বতোভাবে ঋণী। অভয় যদি আমার উপর বিরূপ হয় তাহলে আমার সমস্ত কারবার বন্ধ হয়ে যাবে।

নিজের স্বার্থের জন্য তুমি---

হাঁ, উপায় নেই কোনো।

আলবার্ড চলে যান নিজের কামরায়।

থ'মেরে দাঁড়িয়ে থাকে আর্থার পিতার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে।

কলকাতার মার্চেন্টপ্রিন্স অভয়কর বিশ্বাসকে তে না জানে!

বড় বড় কয়েকটি কোম্পানীর মালিক তিনি। তার সবচেয়ে বড় কোম্পানী সিমেন্ট কারখানা। দৈনিক হাজার হাজার ব্যাগ সিমেন্ট তার কারখানা থেকে দেশ-বিদেশে চালান যায়। আসে লক্ষ লক্ষ টাকা।

অভয়করের কারবারের সঙ্গে কলকাতা শহরের বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট কনট্রাক্টরের যোগাযোগ ছিলো। তারা শহরে বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন অভয়কর বিশ্বাসের কারখানার সিমেন্ট ব্যাগের সাহায্যে। কিন্তু সে সব প্রতিষ্ঠান গড়েই উঠেছে শুধু —তার অস্তিত্ব কতদিন টিকবে কে তা জানে!

শত শত শ্রমিক এ কারখানায় দিবারাত্রি পরিশ্রম করে চলেছে। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে সপ্তাহ পর পায় তারা যৎসামান্য কয়েকটি টাকা। যা তারা পায় তা দিয়ে তাদের সংসার চলে না, অর্ধাহারে অনাহারে গুটিকয়েক ছেলেমেয়ে নিয়ে আস্তাকুঁড়ের মত কুঁড়ে ঘরে বাস করে পথের কুকুরের মত।

আর অভয়কর বিশ্বাস কোটি কোটি টাকার মালিক। কলকাতা শহরের বুকে তার অগণিত বাড়ি-গাড়ি আর ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য।

এহেন অভয়করের নজর পড়লো বাপ-মরা কচি একরত্তি মেয়ে শ্যালনের উপর। শ্যালনকে দেখে তার ভাল লেগেছে, তাই অভয়কর বিশ্বাস উৎসব আসরেই গোপনে কথাটা জানিয়ে বসলেন আলবার্ডের কাছে।

কথাটা শুনে আলবার্ড মনে মনে শিউরে উঠলেও মুখে তিনি হাসিভরা ভাব টেনে শ্যালনকে বলেছিলেন—মা, আমার বন্ধু অভয়কর বিশ্বাস তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে চান।

অভয়কর তাই আসরেই কাঁচপাত্র হস্তে গিয়েছিলেন শ্যালনের সঙ্গে আলাপ জমাতে; কিন্তু শ্যালন অভয়করের আচরণ পছন্দ করেনি —সে ক্রুদ্ধ হয়ে কক্ষ ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলো নিজের কক্ষে।

শ্যালন উৎসব-আসর থেকে রাগতঃ হয়ে চলে গেলেও অভয়কর বিশ্বাস ভরসা হারাননি। কারণ আলবার্ড তার হাতের পুতুল। আলবার্ড ধনকুবের নামে লোকসমাজে পরিচিত হলেও আসলে সে অভয়কর বিশ্বাসের অনুগ্রহের পাত্র। অভয়কর জানেন, আলবার্ড কিছুতেই তাঁর ইচ্ছাকে অপূর্ণ রাখতে পারবে না। যদিও তাঁর বয়স পঞ্চাশের অধিক হয়েছে, তবু তার নাইট-ক্লাবে রাত্রি কাটানো অভ্যাস। বিলাতী মদ আর নারী-ভোগ তার জীবনের এক পরম নেশা।

অভয়কর বিশ্বাসের টাকার অভাব নেই, তাই যা মন চায় তাই তিনি করেন।

শুধু অভয়কর বিশ্বাসই নয়, এমনি আরও কিছুসংখ্যক ধনকুবের মার্চেন্টপ্রিন্স আছেন—যারা লোকসমাজে বাস করে মানুষ নামে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছেন, কিন্তু হৃদয় তাদের মানুসের মত নয়। পশুর মত অন্তঃকরণ নিয়ে পিশাচের মত আচরণ করে চলেন তারা নিরীহ জনগণের প্রতি। নিজেদের ঘরে মা-বোন-স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও পরের মা-বোন-স্ত্রীর প্রতি লালসা-পূর্ণ যৌনভাব পোষণ করতে কিছুমাত্র কসুর করেন না।

শুধু ধনকুবের ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণই নয়, অমন কত বড় বড় চাকুরীজীবী মহান ভদ্রলোক আছেন যাদের মুখোসের আড়ালে লুকিয়ে আছে এক-একটি ভয়ঙ্কর পৈশাচিক শয়তান -প্রাণ। যাদের মন আছে কিন্তু হৃদয় বলে কোনো জিনিস নেই। নিরীহ জনগণের বুকের রক্ত শুষে নিয়ে যারা বেঁচে থাকার প্রয়াস পায়। দেশের মেরুদণ্ড যারা—সে সব অসহায় অবুঝ মানুষগুলোর হাড় চিবিয়ে যারা রস পান করে—তারাই আজ সভ্য সমাজের অধিনায়ক।

অভয়কর বিশ্বাসকে খুশী করবার জন্য আলবার্ডের চোখে ঘুম নেই। সারারাত্রি তিনি কক্ষমধ্যে পায়চারী করে কাটালেন। কিন্তু শ্যালন তার কন্যাস্থানীয়—পিতৃহারা অসহায় একটি তরুণী। আলবার্ড নিজের অধর নিজে দংশন করতে লাগলেন। কি করে এক প্রৌঢ় বিশালদেহী পুরুষের হাতে তুলে দেবেন এ ফুলের মত সুন্দর নিষ্পাপ মেয়েটিকে! অনেক চিন্তা করেও কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হলেন না। আজ ম্যাকমারা নেই, তার কন্যা তারই গচ্ছিত সম্পদ। না না, তা হয় না। নিজ স্বার্থের জন্য এতোবড় অন্যায় তিনি করতে পারবেন না।

কিন্তু কি করে তা সম্ভব! অভয়কর যদি বিরূপ হয় তাহলে তার সমস্ত কারবার বন্ধ হয়ে যাবে। কোম্পানীগুলোতে লালবাতি জ্বলবে। এমনকি হয়তো অভয়কর কৌশলে তাকে পথে বসাতে কসুর করবে না, ছিনিয়ে নেবে সমস্ত সম্পদ।

এর চেয়ে তার মৃত্যু ভাল। যারা তাঁর এতো সহৃদয় বন্ধু তারাই তখন উপেক্ষার হাসি হাসবে। না না, এসব সহ্য করতে পারবেন না। তার চেয়ে শ্যালনকে তুলে দেবেন অভয়কর বিশ্বাসের হাতে। সামান্য একটা মেয়ের জন্য আলবার্ড তার সবকিছু বিসর্জন দিতে পারেন না।

ভোরে টেলিফোনে জানিয়ে দিলেন আলবার্ড তার পরম বন্ধু অভয়করকে এ সুসংবাদটা—আজ রাতে-ই তুমি তোমার কক্ষে পাবে শ্যালনকে।

টেলিফোনের ওপাশে বীভৎস এক হাসির শব্দ হলো—থ্যাঙ্ক ইউ বন্ধু--থ্যাঙ্ক ইউ--জানি তুমি আমার আশা পূর্ণ করবে।

রিসিভার রেখে সোজা হয়ে বসলেন আলবার্ড, ঠিক সে মুহূর্তে তাকিয়ে দেখলেন—কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন বিখ্যাত পিয়ানোবাদক মাসুদ ইরানী। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দীপ্তময় সুন্দর পুরুষ। মাথায় বাদামি রঙ-এর কোঁকড়ানো চুল। এক জোড়া ভ্রুর নীচে দু'টি উজ্জ্বল নীল চোখ। দেহে হাল্‌কা রঙ-এর পোশাক—ঠিক ইরান দেশীয় ড্রেস। মাথায় হাল্‌কা রঙ-এর পাগড়ী।

আলবার্ড উচ্ছল কণ্ঠে বলে উঠলেন—আপনি!

শান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে এলো মাসুদ ইরানী—কাল রাতে ভুল করে আমার ডায়রী রেখে গিয়েছিলাম।

বসুন, আমি এনে দিচ্ছি। হয়তো আর্থার উঠিয়ে রেখেছে।

মাসুদ ইরানী আসন গ্রহণ করলো।

কিছুক্ষণ পূর্বে অভয়করের সঙ্গে আলবার্ড যে ব্যাপার নিয়ে ফোনে আলোচনা করেছিলেন সে কথার রেশ এখনও তার মন থেকে মুছে যায়নি, অন্যমনস্কভাবে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

এমন সময় মিসেস আলবার্ড কক্ষে প্রবেশ করলেন। মাসুদ ইরানী তাকে অভিবাদন করলেন।

মিসেস বার্ড বললেন—শ্যালন মাসুদ ইরানীর আগমন জানতে পেরেছে, সে তার পিয়ানো বাজানো শুনতে চায়।

আলবার্ড হেসে বললেন —বেশ তো, তাকে আসতে বলো। এবার মাসুদ ইরানীর দিকে তাকিয়ে বললেন—শুনলেন তো, মত আছে আপনার?

মাসুদ ইরানী বললো—কারো ইচ্ছা অপূর্ণ রাখা-আমার মতের বিরুদ্ধে, কাজেই আমাকে পিয়ানো বাজাতে হবে।

মিসেস বার্ড চলে গেলেন। একটু পরে ফিরে এলেন —সঙ্গে শ্যালন। শ্যালনের হস্তেই মাসুদ ইরানীর ডায়রীখানা।

শ্যালন ডায়রীখানা মাসুদ ইরানীর হাতে দিয়ে বললো—সবাই কক্ষত্যাগ করার পর আর্থার দাদা ডায়রীখানা এ কক্ষে কুড়িয়ে পেয়ে আমাকে নিয়ে দিয়েছিলেন, আমি তেমনি রেখে দিয়েছিলাম—খুলে দেখিনি।

থ্যাঙ্ক ইউ! মাসুদ ইরানী দাঁড়িয়ে শ্যালনের হাত থেকে ডায়রীখানা নিলো।

শ্যালন আর মিসেস বার্ড আসন গ্রহণ করলো।

ওদিকে ডায়াসের পাশে রাখা পিয়ানোর কাছে গিয়ে বসলো মাসুদ ইরানী। সুরের ঝঙ্কারে কক্ষটা মুখর হয়ে উঠলো। মাসুদ ইরানীর হস্তে জীবন্ত হয়ে উঠলো যেন পিয়ানোখানা।

তন্ময় হয়ে গেলো শ্যালন পিয়ানোর সুরে।

মিসেস বার্ডের মনেও আনন্দের স্রোত বয়ে চললো।

মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে আছে শ্যালন মাসুদ ইরানীর মুখের দিকে।

এক সময় মাসুদ ইরানী পিয়ানো বাজানো শেষ করে উঠে দাঁড়ায়।

শ্যালন বিস্ময় ভরা কণ্ঠে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো—অপূর্ব!

মাসুদ ইরানীর মুখে হাসি ফুটলো।

সেদিনের মত মাসুদ ইরানী বিদায় গ্রহণ করলো আলবার্ড মহল থেকে।

মাসুদ ইরানীকে তার গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলেন আলবার্ড। স্ত্রী এবং শ্যালনকে লক্ষ্য করে বললেন—এমন পিয়ানোবাদকের সন্ধান পাওয়া মুস্কিল। আমার ভাগ্য, তাই আমার উৎসব আসরে মাসুদ ইরানীর মত বাদ্যকরের আগমন হয়েছিলো।

মিসেস বার্ডও অকুণ্ঠ গলায় প্রশংসা করলেন মাসুদ ইরানীর।

আলবার্ড লক্ষ্য করলেন— শ্যালনের মুখমণ্ডল মাসুদ ইরানীর প্রশংসায় স্ফীত-উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

এ-কথা সে-কথার পর এক সময় বললেন আলবার্ড—মা শ্যালন, আজ রাতে এক স্থানে বেড়াতে যাবো, যাবে তুমি?

খুশী ভরা কণ্ঠে বললো শ্যালন—কোথায় যাবে কাকা? অনেকদিন শ্যালন কারো বাড়ি বেড়াতে যায়নি কিনা, বেড়াতে যাওয়ার নাম শুনে আনন্দে আপ্লুত হলো সে।

আলবার্ড হঠাৎ বলেই ফেললেন—আমার বন্ধু অভয়কর বিশ্বাসের বাড়িতে--

সঙ্গে সঙ্গে শ্যালনের মুখ অমাবস্যার অন্ধকারের মত কালো হয়ে উঠলো।

আলবার্ড নিজের ভুল বুঝতে পারলেন।

শ্যালনকে অভয়করের বাড়ি যাওয়ার কথাটা বলায় সে গম্ভীর হয়ে পড়লো।

শ্যালন শেষ পর্যন্ত কিছুতেই আলবার্ডের বাড়ি যাওয়ায় রাজী হলো না।

প্রমাদ গুনলেন আলবার্ড—এখন উপায়? অভয়করকে কথা দিয়েছেন—আজ রাতেই শ্যালনকে পৌছাবেন তার ওখানে।

শ্যালন ক্রুদ্ধভাবে কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেলো নিজের কক্ষে।

আলবার্ড মিসেস আলবার্ডসহ তার কক্ষে গিয়ে অনেক করে বোঝাতে লাগলেন, কিন্তু শ্যালন আর কিছুতেই বাইরে যেতে রাজী হলো না।

শেষ পর্যন্ত প্রচেস্টা চালিয়েও কোনো ফল ফললো না। অগত্য আলবার্ড নিজেই গমন করলেন বালিগঞ্জে বন্ধুবর অভয়করের বাড়িতে।

❑

অভয়কর বিশ্বাস বিপত্নীক।

সন্তান-সন্ততি যারা আছে তারাও মানুষ নয়। পিতার প্রচুর অর্থ—কাজেই লেখাপড়ায় তাদের কি প্রয়োজন। সারা দিনরাত কে কোথায় থাকে বা কাটায় এসব সন্ধান নেবার সময় নেই অভয়কর বিশ্বাসের। তিনটি ছেলে অভয়করের। কেউ বিদ্যায় বিদ্যাপতি না হলেও জুয়া আর মদের আড্ডায় বেশ নাম কিনেছে। ঘোড়ার রেস্ খেলায় পাকা খেলোয়াড় এক-একজন—কোনো বার লক্ষ টাকা হারলো, দ্বিতীয় বার উঠিয়ে নিলো তার ডবল। শহরে তাদের নাম-ডাক আছে যথেষ্ট।

অভয়কর বিশ্বাস বিপত্নীক হলেও তার বাড়িতে মেয়েমানুষের অভাব নেই। আত্মীয়-স্বজনের চেয়ে পরিচিত জনগণই বেশি। সম্পর্কে এক বিধবা বৌদি বিপত্নীক অভয়করের দেখাশোনা করে। আরও আছে যুবতী চাকরানীর দল।

অভয়কর বিশ্বাসের একটি মাত্র কন্যা আরতী।

পিতা এবং ভ্রাতাগণের ঠিক বিপরীত ছিলো আরতী। শিক্ষিতা-বুদ্ধিমতী-জ্ঞানবতী তরুণী ছিলো সে। পিতার অসৎ আচরণের জন্য আরতী শুধু দুঃখিতই ছিলো না—অত্যন্ত ব্যথিত এবং চিন্তিত ছিলো। ভাইগুলোও সব অধঃপতনে গেছে-এটাও তার কম দুঃখ নয়।

আরতী ভাইগুলোর চেয়ে বয়সে ছোট হলেও একেবারে তার বয়স কম নয়। মা-হারা হলেও আরতী নিজের প্রতি ছিলো অত্যন্ত সতর্ক। লেখাপড়া, গান-বাজনা এবং গৃহকর্মে নিপুণা ছিলো সে। ধনকুবের-কন্যা হলেও আরতী ছিলো আদর্শ যুবতী।

যতক্ষণ পিতা বাড়িতে থাকতেন ততক্ষণ আরতী উপর থেকে নীচে নামতো না। চাকার-বাকর দাস-দাসী ছিলো অগণিত; তাছাড়া পিতার বৌদি ছিলেন, তিনিই পিতার তদারক করতেন। আরতী নীচে নেমে আসার প্রয়োজন বোধ করতো না। কোনো কোনোদিন হঠাৎ যদি নীচে নেমে আসতো কোনো কাজের চাপে, তাহলে পিতা আর বিধবা বৌদির আচরণে লজ্জায় মরে যেতো যেন। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে পারতো না সে।

আজ অভয়কর বিশ্বাস আধুনিক ড্রেসে তরুণ যুবকের মত নিজেকে সজ্জিত করে নিয়েছিলেন। হল—ঘরের মেঝেতে তিনি ঘন ঘন পায়চারী করছিলেন। মাঝে মাঝে হাতঘড়িটা দেখছিলেন তিনি।

এমন সময় একখানা গাড়ি এসে থামলো অভয়কর বিশ্বাসের রাজ প্রাসাদসম বাড়িখানার গাড়ি-বারান্দায়।

অল্পক্ষণ পর হল ঘরে প্রবেশ করলেন আলবার্ড।

মুখমণ্ডল গম্ভীর চিন্তাযুক্ত; ঠিক যেন অপরাধীর মত মন্থর গতিতে কক্ষে প্রবেশ করে মাথা নীচু করে দাঁড়ালেন।

অভয়কর বিশ্বাস ফিরে তাকিয়েই হুঙ্কার ছাড়লেন— এসেছো? কিন্তু সে কই?

আলবার্ড মুখ তুললেন, ঢোক গিলে বললেন—অভয়, তাকে কিছুতেই আনতে পারলাম না!

'তাহলে তুমি এলে কেন?

চমকে মুখ তুললেন আলবার্ড।

অভয়কর বিশ্বাস গম্ভীর রাগতকণ্ঠে বললেন আবার—তোমার বাড়িতে আশ্রিতা অথচ তুমি তাকে আনতে পারলে না?

আমি অনেক চেষ্টা করেছি, তুমি বিশ্বাস করো অভয়, আমি--

চুপ করো, আমি তোমার নেকামি শুনতে চাইনে।

আলবার্ড অভয়করের ধমক খেয়ে চুপ করে গেলেন।

অভয়কর পায়চারী শুরু করলেন, ক্রুদ্ধ সিংহের মত আপন মনে গর্জন করতে লাগলেন তিনি। যেমন ক্ষুধিত সিংহ মুখের আহার থেকে বিতাড়িত হলে তার অবস্থা হয়—ঠিক তেমনি।

আলবার্ড প্রমাদ গুণলেন, অভয়করকে খুশী করাই হলো এখন তার চিন্তা। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন তিনি—অভয়, তুমি আমার প্রতি বিরূপ

হচ্ছো কেন? আমার হাতের মুঠায় রয়েছে শ্যালন। সে আসতে না চাইলেও আমি তাকে জোরপূর্বক নিয়ে আসবো তোমার বাড়িতে।

কিন্তু কথাটা বলে কিছুতেই নিজের মনে স্বস্তি পাচ্ছিলেন না, কারণ শ্যালনকে জোর করে আনা এখানে সম্ভব হয়ে উঠবে না। সে যদি নিজ ইচ্ছায় না আসে তাকে ধরে-বেঁধে নিয়ে আসা মুস্কিল। হঠাৎ বলে উঠেন আলবার্ড পুনরায়— অভয়, বসো একটা বুদ্ধি এঁটেছি, সে ভাবে কাজ করলে নিশ্চয়ই শ্যালনকে এখানে নিয়ে আসা মোটেই কষ্টকর হবে না।

কি বুদ্ধি তুমি এঁটেছো বার্ড? একরত্তি একটা মেয়ের সঙ্গে তুমি পারলেনা, আশ্চর্য মানুষ তুমি! কথাটা বলে আসন গ্রহণ করলেন অভয়কর বিশ্বাস।

আলবার্ড তার পাশের সোফায় বসলেন, তারপর বললেন— এক কাজ কররে মন্দ হয় না।

কি কাজ?

শ্যালন অত্যন্ত ভালবাসে মাসুদ ইরানীর পিয়ানো বাজনা। তাকে মাসুদ ইরানীর পিয়ানো বাজনা শোনার ছলনায় আনা যায় এখানে।

বেশ তাই হবে। একটা উৎসবের আয়োজন করো। সে উৎসবে মাসুদ ইরানী পিয়ানো বাজাবে আর শ্যালন হবে তার শ্রোতা। —হাঃ হাঃ হাঃ তারপর ---

তারপর সবাই বিদায় গ্রহণ করলে---

শ্যালন হবে আমার শিকার, তাই না?

হাঁ। একটু থেমে বললেন আলবার্ড —অভয়, শ্যালনকে তোমার হাতে তুলে দিলে তুমি আমায় কোটি টাকার ঋণ থেকে মুক্তি দেবে?

তুমি দেখছি মস্ত এক ফন্দি আঁটছো বার্ড!

ফন্দি নয় অভয়, তুমি জানো—শ্যালন তার বাবাব একমাত্র কন্যা। ম্যাকমারার মৃত্যুর পর সে-ই তার বিশাল ঐশ্বর্যের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী, কাজেই কোটি টাকার সম্পত্তি তোমার হাতে অনায়াসেই এসে যাচ্ছে।

সে দেখা যাবে। অভয়কর বিশ্বাস সিগারেট কেস বের করে একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলেন।

এমন সময় টেবিলে ফোনটা বেজে উঠলো সশব্দে।

রিসিভার তুলে নিলেন হাতে অভয়কর--হ্যালো---ম্যানেজার বাবু--কি বললেন--বিশ হাজার টাকা কেড়ে নিয়েছে--

আপনার কাছ থেকে --কি বললেন---জমকালো পোশাক-পরা একটি লোক--- আপনি কি চুপ করেছিলেন.... রিভলভার ছিলো তার

হাতে....আচ্ছা আমি এক্ষুণি আসছি। রিসিভার রেখে উঠে দাঁড়ালেন অভয়কর।

আলবার্ডের চোখেমুখে বিস্ময়, ভয়ার্ত কণ্ঠে বললেন তিনি —অভয়, কি সংবাদ?

অত্যন্ত সাংঘাতিক। সিমেন্ট কারখানার ম্যানেজারবাবু খিদিরপুর ডগ থেকে বিশ হাজার টাকা নিয়ে বালিগঞ্জ আমার অফিসে ফিরছিলেন, পথে তার গাড়ি রোধ করে এক জমকালো পোশাক-পরা দুর্বৃত্ত সব কেড়ে নিয়েছে---

আশ্চর্য এ সন্ধ্যারাতে কলকাতা শহরে প্রকাশ্য রাজপথে ডাকাতি! আলবার্ডের মুখ চুন হয়ে গেছে কথাটা শুনে।

অভয়কর বিশ্বাসের দু'চোখে আগুন টিকরে বের হচ্ছে। দাঁতে দাঁত পিষে বললেন তিনি—কার এমন সাহস আমার টাকায় হস্তক্ষেপ করে! কলকাতার সেরা গুণ্ডা মহাতক সিং আমার হাতের পুতুল। আজই আমি খুঁজে বের করে পুলিশে দেবো বেটাকে। বার্ড, তুমি অচিরেই একটি দিন দেখে আমার বাড়িতে উৎসবের আয়োজন করো। আর সে উৎসবে মাসুদ ইরানী বাজাবে পিয়ানো। শ্যালনকে আমি ঐদিন--যাও। আর শোন, আমি এখন খুব ব্যস্ত থাকবো কারণ যতক্ষণ আমার অর্থ হরণকারীকে গ্রেপ্তার করতে না পারবো ততক্ষণ আমার স্বস্তি নেই।

অভয়, এ সামান্য বিশ হাজার টাকার জন্য তুমি মরে যাবে না।

মরবো না। বিশ হাজার কেন বিশ লক্ষ টাকার লোকসান গেলেও মরবে না অভয়কর বিশ্বাস। তবু যে দুর্বৃত্ত সাহস পায় তার গায়ে আঁচড় দিতে তাকেও সে রেহাই দেবে না কোনোদিন।

আচ্ছা চলি। আলবার্ড বিদায় গ্রহণ করলেন।

অভয়কর বিশ্বাস অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা এ্যাসট্রেতে নিক্ষেপ করে ফিরে দাঁড়াতেই দরজায় একটা জমকালো ছায়ামূর্তি ভেসে উঠলো, চমকে উঠলো অভয়কর বিশ্বাস।

জমকালো মূর্তির হস্তে উদ্যত রিভলভারের দিকে তাকিয়ে আরষ্ঠ হয়ে গেলো তাঁর কণ্ঠ।

ছায়ামূর্তি এগিয়ে এলো, রিভলভার উদ্যত তার হস্তে। পাশে দাঁড়ালো এসে অভয়করের, চাপা কণ্ঠে বললো—চেয়ারে বসুন।

অভয়কর বিশ্বাস অধর দংশন করছিলেন, বললেন—কে তুমি?

জবাব পরে পাবেন, বসুন চেয়ারে।

অভয়কর বিশ্বাস আসন গ্রহণ করলেন, তারপর বললেন—তুমিই আমার ম্যানেজারের কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা কেড়ে নিয়েছো?

হাঁ।

আবার কি চাও?

সামান্য বিশ হাজার দিয়েই রেহাই পেতে চান?

কি চাও তা হলে?

রিসিভার হাতে উঠিয়ে নিন। জমকালো ছায়ামূর্তি তার হস্তস্থিত রিভলভার অভয়কর বিশ্বাসের কপালের বাম পাশে চেপে ধরলো —রিং করুন আপনার কোম্পানীর ম্যানেজারের কাছে।

অভয়কর বাধ্য হলেন রিসিভার হাতে তুলে নিতে। এমন একটা অবস্থায় পড়বেন তিনি কোনো দিন কল্পনাও করেননি। রিসিভার তার হাতের মুঠায়—ইচ্ছা করলে তিনি এক্ষুণি পুলিশ অফিসে ফোন করতে পারেন। কিন্তু কোনো উপায় নেই, দস্যুর রিভলভার তার ললাটে ঠেকে রয়েছে। জীবনের মায়া কার না আছে।

অভয়করকে ভাবতে দেখে গম্ভীর চাপা কণ্ঠে গর্জে উঠলো কালো ছায়ামূর্তি—চালাকি করলে মরবেন। যা বললাম তাই করুন।

অগত্যা অভয়কর তার ম্যানেজারের নিকট রিং করলেন— হ্যালো হ্যালো---

গলার স্বর স্বাভাবিক করে ফোনে কথা বলুন। কালো ছায়ামূর্তি অভয়কর বিশ্বাসের কানে মুখ নিয়ে কথাটা বললো। হাঁ, এবার বলুন যে শ্রমিকের দল আজ ক'দিন ব্যাপী ধর্মঘট চালানোর পর তারা কারখানার বাইরে ফুটপাতে অপেক্ষা করছে তাদের ন্যায্য পাওনার দাবী নিয়ে—তাদের পাওনার ডবল যেন দিয়ে দেয়া হয়। বলুন, বলুন---

অভয়করের চোখে শর্ষে ফুল ঝরে পড়ে, হাজার হাজার শ্রমিক তার কারখানায় কাজ করে, এদের প্রাপ্য মজুরি তার ডবল দিতে গেলে যে লক্ষ টাকার বেশি লাগবে! তবু বলতে বাধ্য হলেন অভয়কর— হ্যালো--- ম্যানেজার বাবু--

ওপাশ থেকে ভেসে আসে ম্যানেজার বাবুর গলা—হ্যালো--বলুন স্যার---

--আমার কোম্পানীর শ্রমিকগণ যারা ক'দিনব্যাপী ধর্মঘট চালানোর পর সন্ধ্যা থেকে কারখানার বাইরে ধন্না দিচ্ছে তাদের টাকা....মানে ওদের পাওনা টাকার উপর কিছু বেশি--

চাপাকণ্ঠে গর্জে উঠলো কালো ছায়ামূর্তি—কিছু বেশি নয়, বলুন ডবল দিতে।

হ্যালো---হাঁ ওদের ডবল দাম দিয়ে দিন।

ওপাশ থেকে ম্যানেজারের অবাক গলা—স্যার, আজ এতোগুলো টাকা দুর্বৃত্ত চুরি করে নিলো তারপর আবার ---

--হ্যাঁ দিয়ে দিন---

আবার ম্যানেজারের কণ্ঠ—স্যার কোম্পানীর অফিস থেকে টাকা দেবো?

কালোমূর্তি রিভলভার দিয়ে অভয়করের ললাটে চাপ দিয়ে বললো—বলুন, হাঁ।

অভয়কর ঢোক গিলে বললেন—হাঁ।

রাখুন রিসিভার।

অভয়কর রিসিভার রেখে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন —তুমি কে?

জমকালো মূর্তি চাপা গম্ভীর কণ্ঠে বললো—আমি হিতৈষীবন্ধু।

কার?

তোমার এবং দেশের। এবার কালোমূর্তি রিভলভার অভয়করের বুকো চেপে ধরে বললো—চলুন বাথরুমে। আপাততঃ ওখানেই আপনাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

বাথরুমে।

হাঁ। যতক্ষণ আপনার কোম্পানী থেকে শ্রমিক দল বিদায় গ্রহণ না করে ততক্ষণ আপনি ঐ বাথরুমে বন্দী থাকবেন।

অভয়কর কালোমূর্তির আদেশ পালনে বাধ্য হলেন।

বাথরুমে প্রবেশ করে কালোমূর্তি পকেট থেকে সিল্কের রুমাল এবং নায়লনের দু'খানা কর্ড বের করে অভয়করকে মজবুত করে বেঁধে ফেললো। মুখখানা রুমালে বাঁধলো, আর হাত বাঁধলো মজবুত কর্ড দিয়ে। তারপর বেরিয়ে এলো বাথরুম থেকে, দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলো।

ভয়ঙ্কর অভয়কর বিশ্বাসকে কালোমূর্তি কাবু করে ফেলেছিলো। তার বুদ্ধি -কৌশল আর রিভলভারের চাপ দিয়ে।

অভয়কর বিশ্বাস যে কক্ষে বসতেন সে কক্ষে কারো প্রবেশ নিষেধ ছিলো। যতক্ষণ তিনি কলিং বেলে হাত না দিতেন ততক্ষণ কেউ প্রবেশ করতে সক্ষম হতো না সে কক্ষে। কাজেই অভয়করকে কালোমূর্তি বাথরুমে বন্দী করলেও কেউ জানলো না।

❑

অভয়কর বিশ্বাসকে যখন বাথরুম থেকে বের করে আনা হলো তখন রাত বারোটা বেজে গেছে। তিনি ছাড়া পেয়েই গাড়ি নিয়ে ছুটলেন কোম্পানী অভিমুখে।

কিন্তু অভয়কর বিশ্বাস যখন কোম্পানীর লৌহগেটের সম্মুখে এসে পৌছলেন তখন তার মাথায় বাজ পড়লো। শ্রমিকদল খুশীমনে বিদায় নিয়ে চলে গেছে নিজ নিজ আবাসে।

অভয়কর বিশ্বাস মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন অফিসরুমের সোফায়।

মালিকের আগমনে বিলম্ব দেখে চঞ্চলভাবে ঘর-বার করছিলেন ম্যানেজার বাবু। তিনি বিশ হাজার টাকা চুরি যাওয়ার সংবাদ ফোনে জানানোর পর মালিক জানালেন, এক্ষুণি আমি আসছি অথচ তিনি পরক্ষণেই পুনরায় ফোনে জানালেন ধর্মঘটকারী শ্রমিকদের পাওনা টাকার ডবল পরিমাণ তাহাদের দিয়ে দিতে — ম্যানেজার ভেবে পাননা একি ব্যাপার!

এক্ষণ মালিককে হন্তদন্তভাবে কোম্পানীর অফিস রুমে প্রবেশ করে সোফায় বসে পড়তে দেখে ম্যানেজার ঘাবড়ে গেলেন। তিনি ফ্যানের স্পীড্ বাড়িয়ে দিয়ে পাশে এসে দাঁড়ালেন, বিনীত কণ্ঠে বললেন—স্যার।

অভয়কর বিশ্বাস এবার সোজ হয়ে বসলেন, তারপর বললেন—সব দিয়ে দিয়েছেন?

শ্রমিকের টাকার কথা বলছেন স্যার?

হাঁ, সব দেয়া হয়েছে বুঝি?

আপনি বলায় আমি সেভাবে শ্রমিকদের---

সর্বনাশ করেছেন! সর্বনাশ করেছেন ম্যানেজার বাবু। সর্বনাশ করেছেন।

স্যার আপনি---

ম্যানেজার বাবু, যে ডাকু আপনার কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা কেড়ে নিয়েছে, সে ডাকুই আমাকে ফোন করতে বাধ্য করেছে। আমাকে রিভলভারের ভয় দেখিয়ে বাধ্য করেছিলো আপনার কাছে ফোন করতে।

স্যার এ আপনি কি বলছেন?

অদ্ভুত কলো পোশাক পরা এক যুবক—মাথায় ক্যাপ, মুখে কালো রুমাল বাঁধা, দক্ষিণ হস্তে রিভলভার-হঠাৎ আমার কক্ষে প্রবেশ করে সে আমাকে বাধ্য করে নিয়েছিলো।

ম্যানেজার বললেন—স্যার, ঠিক্ আমার গাড়ি রুখে যে ব্যক্তি টাকা কেড়ে নিয়েছে তার দেহেও কালো পোশাক ছিলো— মাথায় ক্যাপ, মুখে কালো রুমাল বাঁধা। আমাকে রিভলভার দেখিয়ে বিশ হাজার টাকা ব্যাগ সমেত সে নিয়ে উধাও হয়েছে।

অভয়কর বলে উঠলেন—একই ব্যক্তি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কে সে যার এতাবড় সাহস আমার সঙ্গে শয়তানী করে—

একটু থেমে বললেন অভয়কর বিশ্বাস —পুলিশে সংবাদ দিয়েছেন?

ম্যানেজার বাবু বললেন—হাঁ, আমি সঙ্গে সঙ্গে লালবাজার থানায় গিয়ে ডায়রী করেছি।

বেশ, এখন আমি নিজে পুলিশ—সুপারের অফিসে গিয়ে সব জানিয়ে আসবো। হাঁ, শুধু পুলিশে জানিয়েই আমি ক্ষান্ত হবো না ম্যানেজার বাবু।

বলুন স্যার?

আমার কোম্পানীর শ্রমিকদের মধ্যেই কেউ এ শয়তানী করেছে, আমি বুঝতে পেরেছি।

ম্যানেজার বাবু বললেন—আমার সে রকম সন্দেহ হচ্ছে। কারণ, শ্রমিকদের প্রতি ডাকুর এমন দরদ কেন?

দেখুন কারো সাধ্য নেই, আমার উপর শয়তানি করে নিজেকে গোপন রাখে। আমি প্রতিটি শ্রমিককে পাকড়াও করে এনে এর প্রতিশোধ নেবো। আচ্ছা, আমার কারখানার ফায়ারম্যানকে ডাকুন, আমি তার দ্বারাই সন্ধান নেবো বা নিতে সক্ষম হবো।

তখনই ফায়ারম্যানকে ডাকা হলো।

বিশালদেহী বলিষ্ঠ জোয়ান একটি লোক এসে দাঁড়ালো কোম্পানীর অফিস-রুমে।

লোকটাকে দেখলেই ভয় হয়। যে কোনো দুর্বল লোকের প্রাণ শিউরে উঠবে তার চেহারা দর্শনে। অভয়করের সিমেন্ট কারখানার হেড্ ফায়ারম্যান সে—নাম ভীম সিং।

অভয়কর বিশ্বাস এভীম সিংকে সব সময় সমীহ করে চলতেন; কারণ এর দ্বারা তিনি অনেক কু-কর্ম সাধন করতে সক্ষম হতেন অনায়াসে। কলকাতার নামকরা গুণ্ডা-সর্দার মহাতক সিং-এর পরম বন্ধুজন ভীম সিং।

অভয়কর বিশ্বাস ভীম সিংকে বললেন—ভীম সিং, এক বাৎ শুনো!

বলিয়ে বড় সাহাব?

তুমারা যানে হোগা মেরা সাৎ।

কাঁহা বড় সাহাব বলিয়ে?

ভীম সিং-এর গোঁফজোড়া খাড়া হয়ে উঠলো.....এমনি আরও কত রাতে অভয়কর বিশ্বাস ভীম সিংকে আদেশ দিয়েছেন—কারো বাড়ি—ঘরে আগুন ধরিয়ে বেটাকে পাকড়াও করে আনতে। হয়তো বা কারো সুন্দরী স্ত্রী বা কন্যাকে চুরি করে আনার বেলাতেও ভীম সিং। কোনো শ্রমিক অপরাধ করলে তাকে সাজা দেবার বেলাতেও সে, কাজেই আজ আবার কোন্ কাজে তার ডাক পড়েছে ভেবে পায় না ভীম সিং। অবশ্য এসব কাজে তার মাইনে বাদেও মোটা টাকা বখশীস আছে। ভীম সিং অভয়করের সিমেন্ট কারখানায় প্রায় দশ বছর হলো চাকরি করছে। আজকাল ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলা

শিখেছে কিছুটা, তবু বলতে তার অসুবিধা হয়। কারখানায় কয়েকজন পাঠান এবং শিখ পাহারাদার আছে, এরা সবাই অভয়কর বিশ্বাসের বিশ্বস্ত কর্মচারী। যেমন দুর্দান্ত তেমনি ভয়ঙ্কর এদের আচরণ।

অভয়কর বিশ্বাস বললেন—মেরা গাড়িমে তুম্ চলো।

ভীম সিং বড় সাহেবকে অনুসরণ করলো।

❑

অভয়কর বিশ্বাসের গাড়ি সোজা গিয়ে পৌছলো শ্যামবাজার একটি ছোট্ট গলির মধ্যে। পোড়ো বাড়ির মত একটা অপরিস্কার বাড়ির সম্মুখে গাড়ি রুখতে বললেন অভয়কর বিশ্বাস ড্রাইভারকে।

অভিজ্ঞ ড্রাইভারটাও আজ যেন কেমন বোকাটে বনে গেছে। অভয়কর বিশ্বাস এ নতুন বিপদের সম্মুখীন হয়ে আজ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন নইলে তিনি ড্রাইভারের আচরণে অসন্তুষ্ট হতেন।

অভয়কর বিশ্বাস গাড়িতেই বসে রইলেন। গাড়ি থেকে নেমে গেলো ভীম সিং।

ভাঙ্গাচোরা বালি খসে পড়া পোড়ো বাড়ির মত ঠিক দেখতে বাড়িটা। ভীম সিং চলে গেলো, একটু পরে একটা ভীষণকায় লোকসহ ফিরে এল সে।

লোকটা গাড়ির মধ্যে অভয়কর বিশ্বাসকে দেখে কুর্ণিশ জানালো—বাবুসাব আপ্!

হাঁ, মহাতক সিং একটা বিপদে পড়ে আমি তোমার স্মরণাপন্ন হয়েছি।

আপ্ অন্দরমে আইয়ে না বাবুসাব?

না, এখানে বসেই দুটো কথা তোমাকে বলে যাবো, তারপর আসবো।

কহিয়ে বাবুসাব? মহাতক সিং নিজের কণ্ঠকে যতদূর সম্ভব নরম করে বললো।

অভয়কর বিশ্বাস এদিক -ওদিক তাকিয়ে দেখে নিচ্ছিলেন।

হেলে বললো মহাতক সিং—এ গলি মে কই নাহি আসবে বাবুসাব, আপ্ বাত কহিয়ে?

অভয়কর বিশ্বাস বললেন—আজ রাত সাড়ে আটটায় কিংবা ন'টা হবে আমার ম্যানেজার বাবু খিদিরপুর থেকে বিশ হাজার টাকা নিয়ে ফিরছিলো, পথে তার গাড়ি আটক করে এক জমকালো পোশাক পরা দুর্বৃত্ত তার নিকট হতে সমস্ত টাকা কেড়ে নিয়েছে---

বিশ হাজার রুপিয়া। বললো মহাতক সিং।

ভীম সিংও কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনছিলো।

অভয়কর বিশ্বাস বললেন আবার—বিশ হাজার টাকা তো সে ম্যানেজারের নিকট হতে নিয়েছে, তারপর আমার বাড়িতে হানা দিয়ে জোরপূর্বক আমাকে বাধ্য করিয়েছিলো কোম্পানীর ম্যানেজারের নিকটে ফোন করতে--

সাঁচ বাত?

হাঁ, আমাকে বাধ্য করেই ম্যানেজারের নিকটে বলিয়েছিলো ধর্মঘটকারী শ্রমিকদের যেন ডবল দাম দিয়ে দেয়া হয়।

এ কোন্ শয়তান? বলে উঠলো ভীম সিং।

অভয়কর বিশ্বাস বললেন—মহাতক, তোমার কাছে এলাম, তুমি সমস্ত কলকাতার গুণ্ডাদলের নেতা। নিশ্চয়ই এ জমকালো পোশাক-পরা লোকটা তোমার দলের হবে।

নেহি বাবুসাব, হামার আদমী নেহি এ-কাম করিয়াছে।

ভীম সিং বললো—হাম্ ভি তো উছে মালুম কিয়া।

কিন্তু কলকাতার লোক ছাড়া বাইরের তো কেউ এসে সাহস পাবে না। জানে না অভয়কর বিশ্বাস শুধু সিংহশাবক নয়, সে তার চেয়েও ভয়ঙ্কর। মহাতক সিং, এ তোমার লোক না হলে কে? কে সে এ জমকালো পোশাক-পরা বুদ্ধিমান ডাকু?

হামি আপনাকে কথা দিচ্ছি বাবু সাব, হামার আদমী হোবে তাহলে আপনি সব রূপিয়া পাইয়ে যাবেন।

রূপিয়া পাই না পাই দুঃখ নেই মহাতক সিং, যদি তুমি তাকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হও, তাহলে তোমাকে আরও বিশ হাজার দেবো।

বাবুজী!

হাঁ মহাতক সিং, অভয়কর বিশ্বাস টাকা যেমন লুটে নিতে জানে তেমনি জানে ছড়িয়ে দিতে। ভীম সিং!

বলিয়ে বড়া সাব?

এ ব্যাপারে তুমি মহাতক সিংকে যথাসাধ্য সাহায্য করবে।

হাম্ জান দেকে বদমাস ডাকু কো পাকাড় লেঙ্গে। আপ্ কই চিন্তা নেহি করিয়ে বড়া সাব।

মহাতক সিং বলে উঠে-কলকত্তা মে কই ডাকু হামারা নজরছে রেহাই না পায়েগা বাবুসাব! হামারা নাম মহাতক সিং। হাম্ দেখে গা কাঁহা কোন্ আদমী আপ্‌কা রূপেয়া লুট লিয়া---

মহাতক সিং সে কারণেই আমি এসেছি তোমার কাছে। পুলিশ যা পারবে না, আমি জানি সে কাজ পারবে তুমি।

আপ্ লোক্ কা মেহেরবানী বাবু সাব। বললো মহাতক সিং।

এবার বল্লেন অভয়কর বিশ্বাস—মহাতক সিং, তুমি আমায় সাহায্য করবে।

ঠিক্ জরুর করিবে বাবু সাব।

আচ্ছা তাহলে চলি। বললেন অভয়কর বিশ্বাস।

বহুৎ আচ্ছা—সেলাম! মহাতক সিং হাতখানা উঠিয়ে কপালে ঠেকালো।

ভীম সিং উঠে বসলো গাড়িতে।

ড্রাইভার গাড়িতে ষ্টার্ট দেবার পূর্বে আর একবার পোড়া বাড়িখানার দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখে নিলো।

গাড়িখানা স্পীডে ছুটতে শুরু করলো এবার।

অভয়কর বিশ্বাস বললেন—ভীম সিং, কাল সকালে কোম্পানীর সমস্ত শ্রমিকদের কারখানায় আসতে বলবে। তারপর আমি সবাইকে কেমন সায়েস্তা করতে হয় করে নেবো। ভীম সিং, তুমি নিজে গিয়ে ওদের দলের সর্দারকে ধরে নিয়ে আসবে।

বহুৎ আচ্ছা বড় সাব।

আমার মনে হয় বেটা সর্দার নাসির আলীর ঐ কাজ।

ভীম সিং বলে উঠে— হাম্ ব্যাটা নাসির আলীকে জান নেকাল্ লেঙ্গে--
-দাঁতে দাঁত পিষে কথাটা বললো সে।

গাড়ির হ্যাণ্ডেলের ওপর ড্রাইভারের হাত দু'খানা মুষ্ঠিবদ্ধ হলো। এ মুহূর্তে—তার মুখোভাব কেউ যদি লক্ষ্য করতো তাহলে সে বুঝতো—ড্রাইভার স্বাভাবিক জন নয়।

বালিগঞ্জ অভয়কর বিশ্বাসের বাড়িতে গাড়ি পৌছলো। ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে দরজা খুলে ধরলো।

অভয়কর বিশ্বাস নেমে গেলেন।

নেমে যাবার সময় বললেন অভয়কর বিশ্বাস—যতীন, ভীম সিংকে কোম্পানীর অফিসে পৌছে দিয়ে এসো।

ড্রাইভার বললো— আচ্ছা স্যার।

মালিক গাড়ি থেকে নেম দাঁড়াতেই ভীম সিংও তার আসন ত্যাগ করে নেমে দাঁড়িয়েছিলো, এবার সে উঠে বসলো ড্রাইভ আসনের পাশের আসনে।

ড্রাইভার গাড়ি বের করে আনলো রাস্তায়।

❑

পরদিন অভয়কর বিশ্বাস সবেমাত্র চায়ের টেবিলের পাশে এসে বসেছেন এমন সময় রঘুনাথ বাগানের মালী সসব্যস্তে ছুটে আসে—হুজুর, হুজুর, এক অদ্ভুত কাণ্ড। দেখবেন আসুন হুজুর---

কি হয়েছে? ধমক দিয়ে বললেন অভয়কর বিশ্বাস।

রঘুনাথের দু'চোখে ভয়-ভীতি আর বিস্ময়, কেমন যেন হাঁপিয়ে পড়েছিলো সে, ঢোক গিলে বললো— হুজুর গ্যারেজে চলুন, দেখবেন হুজুর, চলুন---

কি হয়েছে বল্ না?

হুজুর ড্রাইভার যতীনকো কেউ হাত-পা-মুখ বেঁধে গ্যারেজে ফেলে রেখেছে হুজুর ওধারের চার নাম্বার ফাঁকা গ্যারেজে।

বলিস কি রঘু?

হ্যাঁ স্যার, দেখবেন চলুন।

অভয়কর বিশ্বাস এবং আরও দু'চার জন লোক ছুটলেন চার নাম্বার ফাঁকা গ্যারেজটার দিকে।

চার নাম্বার গ্যারেজটার গাড়ি একটা সামান্য এক্সিডেন্টে জখম হয়ে মোটর—কারখানার হস্‌পিটালে চিকিৎসাধীন ছিলো। গ্যারেজটা সম্পূর্ণ খালি ছিলো।

অভয়কর বিশ্বাস এবং অন্যান্য লোকজন সবাই অবাক হয়ে দেখলো— গ্যারেজের মেঝেতে হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে যতীন— তাঁর নিজস্ব গাড়ির ড্রাইভার।

অভয়করের আদেশে ড্রাইভারের হাত-পা-মুখের বাঁধন উন্মোচন করে দেয়া হলো।

যতীন এবার মুক্তিলাভ করে উঠে বসলো গ্যারেজের মেঝেতে।

অভয়কর বিশ্বাস গর্জন করে উঠলেন—তোমার এ অবস্থা কেন?

যতীন বন্ধন অবস্থায় চেপে যাওয়া স্থানগুলোতে হাত বুলাতে বুলাতে বললো—স্যার, কাল রাতে আপনি যখন আমাকে গাড়ি বের করার আদেশ দিলেন, তখন আমি গ্যারেজে প্রবেশ করে গাড়ি বের করতে যাবো—অমনি জমকালো একটা মূর্তি আমার বুকে রিভলভার চেপে ধরলো। তারপর আমার মুখে রুমাল চাপা দিলো, একটা সুমিষ্ট গন্ধ প্রবেশ করলো আমার নাকের মধ্যে, স্যার, তারপর আর আমার কোনো কথা স্মরণ নেই---

বলো কি! কাল রাতে তুমি আমার গাড়ি ড্রাইভ্ করে আমাকে কোম্পানীতে নিয়ে যাও নি?

না স্যার।

অভয়কর বিশ্বাসের দু'চোখে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হতে লাগলো যেন, তিনি বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে আবার বললেন—শ্যামবাজার মহাতক সিং-এর বাড়ি-

না স্যার, আমি সন্ধ্যার পর আর কোথাও গাড়ি নিয়ে যাইনি।

বলো কি যতীন?

স্যার!

সর্বনাশ, তাহলে ঐ বদমাইস বেটা শয়তান আমার ড্রাইভার সেজে---

কথা শেষ না করে বাম হস্তের তালুতে দক্ষিণ হস্তে মুষ্টিঘাত করেন।

এমন সময় সরকার ভূতনাথ বাবু ব্যস্তভাবে এসে দাঁড়ান— স্যার, কোম্পানীর অফিস থেকে ম্যানেজার বাবু ফোন করেছেন। জরুরী সংবাদ আছে স্যার।

জরুরী! কি আবার জরুরী সংবাদ এলো এ সাত সকালে। অভয়কর বিশ্বাস হলঘরের দিকে চললেন।

নিজস্ব কক্ষে প্রবেশ করে রিসিভার তুলে নিলেন হাতে—হ্যালো স্পিকিং অভয়কর বিশ্বাস---কি বললেন --কি বললেন--ভীম সিং তার কামরায় বন্ধন অবস্থায় ---এ্যাঁ একি বলছেন---হাত -পা-মুখ সব মজবুত করে বাঁধা--! এখানেও আমার ড্রাইভারের সে একই অবস্থা-- হাঁ নিশ্চয়ই সেই দুর্বৃত্ত শয়তানের কাজ। আচ্ছা এক্ষুণি আসছি--

রিসিভার রেখে পায়চারী শুরু করলেন অভয়কর বিশ্বাস। কে তার পিছনে এমন করে লেগেছে—কার এতোবড় সাহস! তার ড্রাইভারকেও গ্যারেজে বন্ধন অবস্থায় রেখে তার গাড়ি ড্রাইভ করে নিয়ে গিয়েছিলো, আর সে জমকালো ছায়ামূর্তিই ভীম সিংকে তার কামরায় হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখেছে, তারই এ-কাজ। কিন্তু কে সে দুর্দান্ত দুরাত্মা।

❑

বনহুর তার ক্যাবিনে বিশ্রাম করছিলো।

মিঠু টেবিলে চা-নাস্তা সাজিয়ে রেখে বললো—স্যার, চা দিয়েছি।

ও! অন্যমনস্কভাবে কিছু চিন্তা করছিলো বনহুর, মিঠুর কথায় উঠে দাঁড়ালো— চা দিয়েছিস্?

হাঁ স্যার।

বনহুর চায়ের টেবিলে এসে বসে। চায়ের কাপ হাতে তুলে নিতেই নজর পড়ে টেবিলো সেদিনের পত্রিকাখানার উপর। চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে পত্রিকাখানা তুলে নেয় হাতে। পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে প্রকাশ পেয়েছে—

"প্রকাশ্য রাজপথে দুর্দান্ত ডাকতি"

কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বাবু অভয়কর বিশ্বাসের প্রধান ম্যানেজার বিনোদ সেন গত রাত্রে যখন তাদের খিদিরপুর কোম্পানী থেকে বিশ হাজার টাকা নিয়ে বালিগঞ্জ অফিসে ফিরছিলেন তখন এক জমকালো পোশাক-পরা দুর্বৃত্ত তার গাড়ি আটক করে সমস্ত-টাকা কেড়ে নেয়। ঐ রাত্রেই পুনরায় সে জমকালো পোশাক-পরা দুর্বৃত্ত শ্রীযুক্ত বিশ্বাসের নিজস্ব কামরায় হানা দেয় এবং তাঁকে জোরপূর্বক তাঁর কোম্পানীর ম্যানেজারের নিকটে ফোন করতে বাধ্য করে। শ্রীযুক্ত বিশ্বাসকে তার শ্রমিকদের ডবল পরিমাণ পারিশ্রমিক দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়। শ্রীযুক্ত বিশ্বাস দুর্বৃত্তের রিভলভারের ভয়ে তার কথামত কাজ করতে বাধ্য হন। পুলিশ এ ব্যাপার নিয়ে জোর তদন্ত চালাচ্ছে।

বনহুরের মুখমণ্ডল গম্ভীর হলো, একটা সিগারেট বের করে অগ্নিসংযোগ করে একমুখ ধূয়া ছুঁড়ে দিলো সম্মুখ দিকে—তারপর হঠাৎ অদ্ভুত ভাবে হেসে উঠলো সে—হাঃ হাঃ হাঃ ----

মনিবের সম্মুখে চা-নাস্তার প্লেট দিয়ে একপাশে দাঁড়িয়েছিলো মিঠু। যদিও সে হোটেলেই বয় হিসেবে কাজ করে তবু বনহুর ওকে হোটেলের ম্যানেজারের কাছে বলে নিজস্ব চাকর হিসেবে গ্রহণ করেছে। অবশ্য যত দিন এ হোটেলে থাকবে বিশেষ করে ততদিনের জন্য। এ জন্য বেশ কিছু টাকাও জমা দিয়েছে হোটেল অফিসে। মিঠুকে বনহুরের প্রথম থেকেই ভাল লেগেছিলো, বেশ কর্মঠ এবং বিশ্বাসী বলে মনে হয়েছিলো তার। মিঠুর মিষ্টিমধুর স্বভাব তাকে মনোমুগ্ধ করেছিলো। আসলে বনহুর সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান, সে এক নজরে মানুষকে চিনে নিতো। এমনকি সে লোকের মুখ দেখলেই তার অন্তরের কথা বুঝে নিতো, অদ্ভুত এ দক্ষতা ছিলো তার। মিঠুকে তাই বনহুর গ্র্যাণ্ড হোটেলে আপন করে নিতে পেরেছিলো প্রথম দিন থেকেই। ছেলেটি সরল এবং বিশ্বাসী তাতো-কোনো সন্দেহ নেই। মিঠুও হঠাৎ যেন ভালবেসে ফেলেছিলো নতুন আগন্তুকটিকে। এ হোটেলে কাজ করার পর তাকে বহু লোকের তত্ত্বাবধান করতে হয়েছে, কিন্তু কাউকে তার এতো ভাল লাগেনি। প্রথম নজরে মিঠুর একটা শ্রদ্ধা এসে গিয়েছিলো বনহুরের প্রতি।

হঠাৎ বনহুরের হাসিতে অবাক হয়ে যায় মিঠু, বলে—স্যার, কাগজে কি লিখা আছে?

বনহুর অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো, মিঠুর কথায় কোনো জবাব দেয় না। সিগারেট থেকে অবিরত ধূম্র নির্গত করে চলে। কুণ্ডলীমান ধূম্ররাশির দিকে তাকিয়ে গভীর চিন্তায় তালিয়ে যায়---শুধু অভয়কর বিশ্বাসকে সায়েস্তা করলেই চলবে না—এমন আরও কতগুলো দুর্দান্ত শয়তান আছে, তাদেরকেও দমন করতে হবে। বাংলাদেশে যখন সে আগমন করেছে তখন সে দেখে নেবে একবার সবাইকে---

স্যার চা-নাস্তা ঠাণ্ডা হয়ে গেলো যে।

মিঠুর কথায় সম্বিৎ ফিরে পায় বনহুর—উঁ!

স্যার, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

বনহুর চায়ের কাপটা তুলে নেয় হাতে।

চা-নাস্তা খাবার পর উঠে পড়ে বনহুর—মিঠু, আমি বাইরে যাচ্ছি, ফিরতে হয়তো দেরী হবে।

আচ্ছা স্যার।

বনহুর বেরিয়ে যায়।

মিঠু বনহুরের পরিত্যাক্ত পোশাক-পরিচ্ছদগুলো সুন্দর করে গুছিয়ে রাখে।

বনহুরের গাড়ি এসে থামলো মানিকতলা শ্রমিকদের বস্তির পাশে।

অপরিচ্ছন্ন নিকৃষ্ট একটা জায়গা।

টিন এবং খোলার ছোট ছোট চালাঘর। কোনটার বা চালের খানিকটা অংশ নেই, সেখানে গুঁজে রাখা হয়েছে কেরোসিন তেলের টিনের পাত বা ছেঁড়া চট। ঘরগুলোর বেড়াও মজবুত নয়, বাঁশের চাটাই বা ঐ ধরণের এটা সো দিয়ে কোনো রকমে চারধার ঘেরাও করা হয়েছে।

বনহুর এসে দাঁড়ালো এ বস্তির মধ্যে। দেহে তার স্বাভাবিক পাজামা আর পাঞ্জাবী —সাধারণ ড্রেস।

বনহুরকে দেখেই কতগুলো অর্ধ-উলঙ্গ হাড়-জিড়জিড়ে ছেলেমেয়ে এসে ঘিরে দাঁড়ালো—অবাক হয়ে সবাই দেখছে বনহুরকে। তাদের এ নিকৃষ্ট বস্তিতে কোনো ভদ্রলোক তো আসে না কোনোদিন, তাই ওদের চোখে এত বিস্ময়।

কতগুলো অর্ধ-উলঙ্গ নারী কুঠিরের মধ্য থেকে উঁকিঝুকি দিয়ে দেখতে লাগলো, সম্মুখে বেরুবার মত কাপড় তাদের দেহে নেই। ময়লা জীর্ণ তালিযুক্ত কাপড় দিয়ে কোনোরকমে যেন লজ্জা নিবারণ করছে ওরা।

বনহুর এগুলো বস্তির ভিতরে। বিরাট কলকাতা শহরের বড় বড় অট্টালিকার আড়ালেও যে এমন অপরিচ্ছন্ন-অপরিস্কার বিদঘুটে বস্তি আছে ভাবতেও যেন কেমন লাগে। যেমন বস্তি তেমনি তার মানুষগুলো। শহরের পরিচ্ছন্ন বাবুদের পাশে এরা যেন এক একটা অদ্ভুত জীব।

বনহুর যত এগোয় তত অবাক হয়।

একটা বস্তির ছোট হোটেলের পাশে এসে থমকে দাঁড়ায় বনহুর, দেখতে পায়—কতগুলো নেংটা ছেলে-মেয়ে একটা ডাষ্টবিনের পাশে স্তুপাকার ময়লা আবর্জনার মধ্যে এঁটো পাতা আর উচ্ছিষ্ট মাংসের হাড়গোড় নিয়ে মারামারি-কাড়াকাড়ি করছে। বর্ষার দিন না হলেও ভেজা স্যাত সেঁতে জায়গা—একটা উৎকট দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে সেখান থেকে। হয়তো মাছের পঁচা আঁশের গন্ধ হবে। বনহুর দাঁড়াতে পারে না, এগিয়ে যায় হোটেলটার দিকে।

হোটেলের মালিক পায়া-ভাঙ্গা একটা টেবিলের সামনে হাতল ভাঙ্গা একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে হিসাব লিখছিলো। কতগুলো বস্তির কুলি-

মজুরের দল হোটেলের চালার নীচে বসে খোশ গল্প করছিলো আর টিনের বাটিতে চা পান করছিলো।

হঠাৎ মালিকের নজর পড়ে গেলো বনহুরের দিকে। এমন ধরনের ভদ্রলোক সচরাচর এদিকে কোনোদিন দেখেনি সে, তাড়াতাড়ি আসন ছেড়ে এগিয়ে এলো—স্যার, কি চাই?

বনহুর বললো—বস্তির সর্দারকে আমার প্রয়োজন কোন্ দিকে যাবো?

মালিক বললো—নাসির আলীকে খুঁজছেন স্যার?

হাঁ ঠিক্ বলেছো।

মালিক ডাকলো —গণেশ, গণেশ---

কি বলছো দাদা? ওদিকের বেঞ্চিতে বসে পান চিবুচ্ছিলো একটি লোক; মালিকের ডাকে জবাব দিলো।

মালিক বললো আবার—গণেশ, তোদের সর্দারকে উনি খুঁজছেন, ডেকে .দে দেখি।

গণেশ গা-মোড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, তারপর এগিয়ে এলো বনহুরের সামনে—কাকে চান বাবু?

তোমাদের সর্দারকে চাই।

চলুন বাবু। আগে আগে চললো গণেশ।

বনহুর তাকে অনুসরণ করলো। তার গাড়িখানা বস্তির গলির মুখে রেখে এসেছে।

নোংরা অপরিস্কার কর্দমযুক্ত গলির মধ্যে এগুতে এগুতে বললো গণেশ—বাবু, আমরা যেমন জায়গায় বাস করি তেমন জায়গায় আপনাদের আসা চলে না। কোনো রকমে জীবনে বেঁচে আছি আমরা।

বললো বনহুর—তা দেখতেই পাচ্ছি!

গলির দু'পাশে স্তূপাকার আবর্জনা, পথ চলতে কষ্ট হচ্ছিলো বনহুরের, দুর্গন্ধে পেটের নাড়িভূঁড়ি বেরিয়ে আসতে চাচ্ছিলো তার।

পথ চলতে দু'পাশের খুপড়িগুলোর মধ্যে নজর যাচ্ছিলো, ভিজে স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে কতগুলো কালি-মাখা হাড়ি-পাতিল ছড়িয়ে আছে। কোনোটার মধ্যে খেঁজুর পাতার চাটাই বিছিয়ে জীর্ণদেহী কোনো মহিলা শিশুকে আঁকড়ে ধরে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছিলো। কোনোটার মধ্যে নেংটা দুটো ছেলে ভাতের ফ্যান নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে। তাদের চারপাশে বনবন করে উড়ছে মাছিগুলো। বনহুরের চোখে এসব দৃশ্য যেন অসহ্যনীয় লাগছে। এমনিভাবে মানুষ কোনো দিন বাঁচতে পারে!

একটা খুপড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো গণেশ। খানিকটা জায়গা চটের আড়াল করে উঠান তৈরি করা হয়েছে। একপাশে কতগুলো হাঁস-মুরগী ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে ঘুরছিলো!

গণেশ ডাকলো—আলী ভাই, আলী ভাই---

অর্ধবয়স্ক এক বলিষ্ঠ পুরুষ বেরিয়ে এলো গণেশের সঙ্গে। একজন ভদ্রলোককে দেখে আদাব দিলো সে।

গনেশ বললো—বাবু এ আমাদের নাসির আলী ভাই।

বনহুর নাসির আলীর পা থেকে মাথা অবধি নজর বুলিয়ে নিয়ে বললো—তুমি কি খিদিরপুর অভয়কর বিশ্বাসের সিমেন্ট কারখানার কাজ করো?

জ্বি হাঁ।

কথা আছে তোমার সঙ্গে।

বাবু, এখানে দাঁড়িয়ে তো কথা হয় না, কিন্তু ---নাসির আলী ভিতরে চলে গেলো, একটু পরে ফিরে এলো একটা ছোট্ট টুল নিয়ে। দ্বিধাজড়িত গলায় বললো—কোথায় বসতে দি বাবু---

থাক্ থাক্ বসতে হবে না, দাঁড়িয়েই হবে। নাসির আলী, সিমেন্ট কারখানায় তোমরা কতজন আন্দাজ কাজ করো?

একটু চিন্তা করে বলে নাসির আলী—প্রায় দু'হাজার আড়াই হাজারের মত---একটু থেমে বলে সে—আপনি কি আমাদের মালিকের লোক?

না, তোমাদের মালিকের লোক আমি নই।

আপনি তাহলে---

মনে করো আমি তোমাদেরই একজন।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে নাসির আলী আর গণেশ বনহুরের পৌরুষদীপ্ত সুন্দর মুখখানার দিকে। কে এ যুবক যে তাদের এ নিকৃষ্ট বস্তির মধ্যে বিনা সঙ্কোচে প্রবেশ করে এমন সহানুভূতিপূর্ণ কথা বলতে পারে! চিরদিন যারা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আর তিরস্কার পেয়ে এসেছে। মততায় ভরে উঠে ভদ্রযুবকের আবেগমধুর গম্ভীর কণ্ঠস্বরে।

বনহুর বলে—নাসির আলী, আমি তোমাদের সাহায্য করতে চাই। তোমাদের মালিক যেন আর তোমাদের উপর অত্যাচার-অনাচার-উৎপীড়ন চালাতে না পারে এ ব্যবস্থাই আমি করবো।

বাবু!

নাসির আলী আমার কথা মত চলতে পারবে?

পারবো। কি করতে হবে বলুন বাবু?

তোমরা সমস্ত শ্রমিক মিলে কাজ বন্ধ করে দাও।

তাতো দিয়েছিলাম। দু'সপ্তাহ আমরা ধর্মঘট করেছিলাম। বাবু এ কদিনে আমরা শুকিয়ে মরেছি। আমাদের ঘরে তো কোনো খাবার নেই, তাই মালিক যা দেন তাতেই আমরা খুশী হয়ে কাজ করি।

এবার থেকে তোমাদের মজুরি ডবল বাড়িয়ে না দিলে কিছুতেই কাজ করবেনা।

তাহলে আমাদের না খেয়ে মরতে হবে বাবু।

যাতে তোমরা না মরো সে চেষ্টা আমি করবো।

কিন্তু মালিক কাল রাতে আমাদের পাওনা টাকার ডবল দিয়েছেন।

সে টাকা পেয়েই বুঝি ভুলে গেছো সব?

না বাবু, তা কি আর ভুলি। জানি, একটা কোনো নতুন ফন্দি এঁটেছেন তাঁরা।

হাঁ, নতুন ফন্দিই বটে, শোন তোমরা কাল রাতে যে ডবল মজুরি পেয়েছো— তার জন্য তোমাদের সাজা পেতে হবে।

সাজা? কেন? বললো নাসির আলী।

বনহুর বললো—মালিক নিতান্ত বাধ্য হয়েই তোমাদের টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। যাক সে কথা, আমি তোমাদের যেভাবে বলবো সেভাবে কাজ করবে।

গণেশ আর সে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিলো একবার। হয়তো কোনোরকম সন্দেহের দোলা লেগেছে তাদের মনে। হঠাৎ অজানা অচেনা একটা যুকের মুখে এসব কথা—আশ্চর্য হয়ে গেছে ওরা।

বনহুর বললো—নাসির আলী, অভয়কর বিশ্বাস তোমাদের উপর জুলুম চালাবে, কিন্তু কিছুতেই তোমরা কাজে রাজী হবে না। আমি জানি, তোমাদের দ্বারা যে সিমেন্ট তৈরি হয় তার অর্ধেক ভেজাল মেশানো থাকে।

বাবু, এ কথা আপনি কি করে জানলেন? বললো নাসির আলী।

গণেশের মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠলো, আবার নাসির আলী আর গণেশ একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিলো। কারণ তাদের সিমেন্ট কারখানার ভেজাল ব্যাপারের গোপন রহস্য একমাত্র কারখানার ভিতরের লোক ছাড়া আর কেউ জানে না।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—সিমেন্টে আর একচুল ভেজাল মেশানো চলবে না।

বাবু, আমাদের কোনো দোষ নেই। বললো গণেশ।

নাসির আলী বললো —আপনি নিশ্চয়ই সি. আই. ডি পুলিশের লোক?

হাঁ, পুলিশের লোক বটে। আচ্ছা, মনে থাকবে আমি যা বললাম?

থাকবে বাবু।

যদিও তোমরা ধর্মঘট ভেংগেছো, তবু তোমরা কাজে যোগ দেবে না, যতক্ষণ মালিকা তোমাদের পারিশ্রমিক ডবল বাড়িয়ে না দেন। আর দ্বিতীয় কথা—কারখানায় যে সিমেন্ট তৈরি হবে তাতে কোনো রকম ভেজাল মেশাতে পারবে না।

মালিক যদি হুকুম করেন তাহলে আমরা কি করবো?

তোমরা তাহলে কাজ করতে রাজি হবে না।

কিন্তু---

কোনো কিন্তু নয় নাসির আলী। হাঁ, এ নাও---বনহুর পকেট থেকে এক তোড়া নোট বের করে নাসির আলীর হাতে দেয়—এ টাকা তুমি বস্তির

প্রত্যেক ব্যক্তিকে দেবে। কেউ যেন অভাবের তাড়নায় মালিকের শয়তানিতে সাহায্য করতে এগিয়ে না যায়।

কথা শেষ করে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলো না বনহুর; চলে গেলো যে পথে এসেছিলো সে পথে।

নাসির আলী আর গণেশ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো চিত্রাপিতের মত।

❑

বনহুর চলে যাওয়ার অল্পক্ষণ পর ভীম সিং তার কয়েকজন লোক নিয়ে হাজির হলো বস্তিমধ্যে। কর্কশ-কঠিন কণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়লো—নাসির। নাসির---

ভীম সিং-এর গলার আওয়াজ পেয়ে কেঁপে উঠলো বস্তির লোক। সবাই জানে ভীম সিং কতবড় নির্দয় আর হৃদয়হীন। পিশাচের চেয়েও ভয়ঙ্কর সে।

নাসির আলী তখন বস্তির মধ্যে লোকজনদের ডেকে একটু পূর্বে বনহুরের মুখে শোনা উক্তিগুলোই করছিলো এবং টাকাগুলো সকলের মধ্যে সমানভাগে ভাগ করে দিচ্ছিলো।

ভীম সিং-এর হুঙ্কারে নাসির আলী ওদিকে শ্রমিকদের দলের মধ্য হতে বেরিয়ে আসে। ভীম সিং-এর সম্মুখে এসে দাঁড়ায়।

গর্জে ওঠে ভীম সিং—নাসির। আভি চলো কারখানা মে তুম্ হারা যানে হোগা।

নাসির আলী স্থির কণ্ঠে বললো—এখন যেতে পারবো না।

কিয়া? যানে নাহি সেকোগে?

না, এখন আমার সময় নেই।

তুমকো জানে হোগা। ভীম সিং গর্জন করে উঠলো। পরক্ষণেই ইংগিত করলো তার দু'জন পাঠান সঙ্গীকে।

সঙ্গে সঙ্গে পাঠান সঙ্গীদ্বয় নাসির আলীর দু'বাহু চেপে ধরলো। তারপর টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে অদূরে থেমে থাকা গাড়িতে উঠিয়ে নিলো তাকে।

❑

কারখানার অফিস-ঘর।

চেয়ারে উপবিষ্ট অভয়কর বিশ্বাস। কোম্পানীর আরও দু'জন বড় সাহেবও বসে রয়েছেন। সকলেরই চোখে মুখে ক্রুদ্ধ হিংস্রভাব।

ভীম সিং ও আরও একজন পাঠান পাহারাদার দণ্ডায়মান। ভীম সিং-এর হস্তে তীক্ষ্ণ চাবুক, চোখ দুটি যেন অগ্নিগোলকের মত জ্বলজ্বল করছে।

অফিস রুমের প্রশস্ত মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে পড়ে আছে শ্রমিকদের সর্দার নাসির আলী। জামা তার ছিঁড়ে গেছে, রক্ত গড়িয়ে পড়ছে তার পিঠের চামড়া কেটে।

অভয়কর বিশ্বাস গর্জে উঠলেন—যতক্ষণ না ও আসল কথা স্বীকার করছে ততক্ষণ চাবুক চালাও।

সঙ্গে সঙ্গে ভীম সিং-এর হস্তের চাবুক সপাং করে পড়ে নাসির আলীর পিঠে।

অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠে নাসির আলী—উঃ মা গো...

ভীম সিং দাঁতে দাঁত পিষে বলে—বোল্ শালা, বোল্ কোন্ আদমী কালা পোশাক লেকর্ আতা হ্যা?

আমি বলছি কিছু জানিনা। আমি কিছু জানিনা..

জানতা নেহি? কথার সঙ্গেই ভীম সিং-এর হাতের চাবুক সপাং করে পড়লো নাসির আলীর পিঠে।

জানিনা! জানিনা কে সে কালো পোশাক-পরা আদমী।

আমি জানিনা...হাঁউ মাঁউ করে কেঁদে উঠে নাসির আলী।

অভয়কর বিশ্বাস উঠে আসেন, বুটের লাথি লাগান ওর হাতের কনুই-এ —জানিস না বললেই আমরা বিশ্বাস করবো তোর কথা।

নিশ্চয়ই সে তোদের দলের লোক।

আমি কসম খেয়ে বলছি, আমি জানিনা!

ফের মিছে কথা! ভীম সিং, ওর জান বের করে নে।

বহুৎ আচ্ছা বড় সাহেব। ভীম সিং পুনরায় নাসির আলীর দেহে আঘাত করার জন্য চাবুক উঠায়।

সঙ্গে সঙ্গে দরজায় এসে দাঁড়ায় কালোমূর্তি—খবরদার, আর একবার আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে মরবে।

একসঙ্গে চমকে তাকায় সবাই দরজার দিকে। অভয়কর বিশ্বাস এবং অন্যান্য সকলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে—দেখতে পায়, জমকালো মূর্তির উভয় হস্তে উদ্যত রিভলভার। বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠে কক্ষস্থ সকলের মুখ।

নাসির আলী হামাগুড়ি দিয়ে সোজা হয়ে বসে। তারও দু' চোখে বিস্ময়। এ কালোমূর্তির জন্যই তাকে এভাবে নিমর্ম সাজা দেয়া হচ্ছিল। সে নিজেও জানেনা কে এ কালোমূর্তি, যার জন্য তার এ অবস্থা।

ভীম সিং ফিরে তাকাতেই তার দক্ষিণহস্তে বিদ্ধ হলো কালোমূর্তির রিভলভারের একটি গুলো। ভীম সিং-এর হাত থেকে ছিটকে খসে পড়লো-সুতীক্ষ্ণ চাবুকখানা, আর্তনাদ করে বসে পড়লো সে মেঝেতে।

ক্ষণিকের জন্য কক্ষস্থ সবাই হকচকিয়ে গেলো।

কালোমূর্তি মুহূর্ত বিলম্ব না করে নাসির আলীর হাত ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিলো, তারপর দ্রুত তাকে সঙ্গে করে বেরিয়ে গেলো কোম্পানীর লৌহগেটের সম্মুখে থেমে থাকা গাড়ির পাশে।

লৌহগেটের পাহারাদারদ্বয়কে পূর্বেই কৌশলে হাত-পা-মুখ বেঁধে ফেলে রেখেছিলো, কাজেই চট করে কেউ বাধা দিতে পারলো না কালোমূর্তির চলার পথে।

নাসির আলীকে ড্রাইভিং আসনের পাশে বসিয়ে কালোমূর্তি বসলো ড্রাইভিং আসনে, তারপর গাড়ি ছুটতে শুরু করলো উল্কাগতিতে।

অভয়কর বিশ্বাস তার পাঠান পাহারাদারগণকে হুকুম দিতে দিতে কালোমূর্তির গাড়ি কোম্পানীর এরিয়া ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। রাতের আঁধারে মিশে গেলো বড় রাস্তার বাঁকে।

নাসির আলীকে দুপুরবেলা ধরে এনে গোটাদিন কারখানার এক অন্ধকার ঘরে বন্দী করে রেখেছিলো ভীম সিং। রাতে যখন মালিক কোম্পানীতে এলেন তখন নাসির আলীকে তাঁর সম্মুখে হাজির করা হলো এবং তার উপর চললো নির্মম অত্যাচার।

অভয়কর বিশ্বাস এবং তার দলবল কল্পনাও করতে পারে নি নাসির আলীর উপর অত্যাচার চলাকালে পুনরায় কালোমূর্তির আর্বিভাব ঘটতে পারে। তারা পরম নিশ্চিন্তে নাসির আলীর উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে যাছিলো। তাদের ধারণা, কালোমূর্তি সেজে স্বয়ং নাসির আলীই এ কাজ করতো বা করেছে।

তা না হলেও কালোমূর্তি নাসির আলীর লোক।

এ মুহূর্তে অভয়কর বিশ্বাস এবং তাঁর অন্যান্য সাঙ্গপাঙ্গ হাবা বনে গিয়েছিলো। কোম্পানীর লৌহফটকে রাইফেলধারী পাঠান পাহারাদার থাকা সত্ত্বেও কালোমূর্তি কি করে কোম্পানীর মধ্যে প্রবেশে সক্ষম হলো এবং কোম্পানীর মধ্যেও বহু লোকজনের চোখে ধূলো দিয়ে একেবারে কারখানার অফিসরুমে এসে ভীম সিংকে আহত করে বন্দী নাসির আলীকে নিয়ে উধাও হলো।

কালোমূর্তি তো উধাও হয়েছে, তার পিছনে ছুটেও এখন তাকে পাকড়াও করা হয়তো সম্ভব হবে না। উপস্থিত তারা ভীম সিং-এর হাতের ক্ষত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

❑

গাড়ি এসে থামলো নির্জন গঙ্গাতীরে।

অনেক পথ ঘুরে ফিরে তবে কালোমূর্তি তার গাড়ি নিয়ে এ জনহীন গঙ্গার ধারে এসে গাড়ি থামালো।

নাসির আলীর মুখে কোনো কথা নেই। সে নিজেও ভীষণভাবে আশ্চর্য হয়ে গেছে, তার মনেও বিপুল জানার বাসনা—কে এ কালোমূর্তি যে তাকে উপস্থিত বিপদ থেকে বাঁচিয়ে আনলো।

কালোমূর্তি বুঝতে পারলো—নাসির আলী তার আচরণে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেছে। মুখের আবরণ উন্মোচন না করেই বললো সে— খুব অবাক হয়েছো নাসির আলী! বিশেষ করে আমার জন্যই তোমাকে ওরা শাস্তি দিচ্ছিলো। তোমার এ কষ্টের জন্য দায়ী আমিই।

কথার ফাঁকে নাসির আলীর হাতের বাঁধন মুক্ত করে দিলো কালোমূর্তি, তারপর আবার বললো—নাসির আলী, আমার পরিচয় জানার জন্য তুমিও অত্যন্ত উৎসুক হয়ে পড়েছো জানি। শোন তবে, আমি তোমাদের হিতৈষী বন্ধু—এটুকুই আমার পরিচয়।

হিতৈষী বন্ধু! অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলো নাসির আলী।

হাঁ, ভয় পেয়ে না নাসির আলী, যখনই বিপদে পড়বে তখনই আমাকে পাশে পাবে।

নাসির আলীর মুখে কোনো কথা সরলো না।

কালোমূর্তি বললো—নাসির আলী, এবার তুমি বাস্ ধরে তোমার বাড়িতে ফিরে যাও। ভীম সিং-এর হাত নিয়ে সবাই ব্যস্ত আছে, তোমার সন্ধানে আজ আর কেউ আসবে না।

নাসির আলী বললো—আচ্ছা হুজুর।

নাও বাস ভাড়ার জন্য পয়সা।

কালোমূর্তি কয়েক আনা পয়সা বের করে নাসির আলীর হাতে গুঁজে দিলো।

নাসির আলী গঙ্গার তীর বেয়ে বড় রাস্তায় উঠে এলো।

কালোমূর্তি অন্ধকারে তার পোশাক পাল্টে ফেললো। সুন্দর প্যান্ট-সার্ট-টাই-পরা এক ভদ্রলোক বনে গেলো সে। তার পরিত্যক্ত পোশাকগুলো লুকিয়ে রাখলো ড্রাইভিং আসনের নীচে।

আবার ফিরে এলো সে কোম্পানীর লৌহফটকের সম্মুখে।

গাড়ি থামতেই ছুটে এলো দুজন লোক। একজন বললো— আপনি কোথা থেকে আসছেন স্যার?

ড্রাইভিং আসন থেকে বললো ভদ্রলোক—আমি ষ্টার থিয়েটার হল থেকে আসছি, মাসুদ ইরানীর লোক।

লোক দুটির একজন ভিতরে চলে গেলো এবং অল্পক্ষণ পরে ফিরে এলো—আসুন ভিতরে।

কোম্পানীর গেট খুলে গেলো, গাড়ি নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো মাসুদ ইরানীর লোক।

গাড়ি অফিস-রুমের দরজায় পৌঁছতেই সসব্যস্তে ছুটে এলেন অভয়কর বিশ্বাসের প্রধান সহকারী—আসুন অফিস-রুমে।

মাসুদ ইরানীর লোক লক্ষ্য করলো, তার গাড়ির পাশেই অদূরে আর একটি গাড়ি দাঁড়িয়েছিলো, গাড়িখানা যে হসপিটালের গাড়ি তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মাসুদ ইরানীর লোক অফিস-রুমে প্রবেশ করে থমকে দাঁড়ালো। ভীম সিং মেঝেতে বসে আছে, মুখমণ্ডল তার যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে উঠেছে। ডাক্তার এবং আরও দু'জন লোক তার হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে ব্যস্ত।

অভয়কর বিশ্বাসকেও অত্যন্ত উত্তেজিত মনে হলো।

মাসুদ ইরানীর লোককে দেখে তিনি এগিয়ে এলেন, নিজেকে কিছুটা প্রকৃতিস্থ করবার চেষ্টা করে বললেন—আপনি মাসুদ ইরানীর ওখান থেকে এসেছেন বুঝি?

মাথার ক্যাপ খুলে সাহেবী কায়দায় কুর্ণিশ জানিয়ে বললো মাসুদ ইরানীর লোক—হাঁ, আমি তাঁর ওখান থেকেই এসেছি। আপনি বুঝি---

হাঁ আমিই মিঃ বিশ্বাস। একটু থেমে বললেন অভয়কর বিশ্বাস—এই কিছুক্ষণ পূর্বে আমার একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। বসুন আপনি।

মাসুদ ইরানীর লোক আসন গ্রহণ করবার পূর্বে বললো—আমার নাম সাঈদ ইরানী, সম্পর্কে আমি মাসুদ ইরানীর ছোট ভাই। ভাই-এর কথায় আমি আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে এসেছি।

ধন্যবাদ! খুশী হলাম অনেক। বললেন অভয়কর বিশ্বাস।

সাঈদ ইরানী অদূরস্থ ভীম সিং-এর যন্ত্রণা-বিকৃত মুখখানার দিকে তাকিয়ে ব্যথিত কণ্ঠে বললো—আপনার দুর্ঘটনার জন্য আমি দুঃখিত, জানি না কি ঘটেছে?

অভয়কর বিশ্বাস গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—কিছুক্ষণ পূর্বে এক জমকালো পোশাক-পরা দুর্বৃত্ত আমার অফিস-রুমে হানা দেয় এবং আমার বিশ্বস্ত কর্মচারী ভীম সিংকে রিভলভারের গুলীতে আহত করে পালিয়ে যায়।

আশ্চর্য! সে শুধু ভীম সিংকে আহত করেই পালায়? টাকা—পয়সা---

না, সে সব নেবার সুযোগ তার হয়নি।

এমন সময় বাইরে পুলিশ ভ্যানের হর্ণের শব্দ শোনা যায়।

অভয়কর বিশ্বাস বলেন—পুলিশ এসেছে।

কক্ষের বাইরে ভারী বুটের শব্দ শোনা যায়।

সাঈদ ইরানী তার মাথার ক্যাপটা আর একটু টেনে দেয় সম্মুখে।

কক্ষে প্রবেশ করেন ইন্সপেক্টার রাজেন্দ্রনাথ এবং লালবাজার থানার ও-সি মিঃ ভৌম। পিছনে দু'জন পুলিশ।

অভয়কর বিশ্বাস তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন।

মিঃ রাজেন্দ্রনাথ বললেন—দুর্বৃত্ত আপনার কর্মচারীকে জখম করার সঙ্গে সঙ্গেই পালিয়েছে?

হাঁ ইন্সপেক্টার!

কিন্তু এখন আমরা কি করতে পারি বলুন?

তবু পুলিশে সংবাদ না দিয়ে পারলাম না। দেখুন দুর্বৃত্ত আমার পিছনে ভয়ানকভাবে লেগেছে। সব সময় আমাকে আশঙ্কা নিয়ে কাটাতে হচ্ছে। আচ্ছা আপনারা বসুন, আমি সব খোলসা করে বলছি।

মিঃ রাজেন্দ্রনাথ এবং মিঃ ভৌম আসন গ্রহণ করলেন।

অভয়কর বিশ্বাস বললেন—হাঁ, তার পূর্বে এঁর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেই। ইনি বিখ্যাত পিয়ানোবাদক মাসুদ ইরানীর সহোদর সাঈদ ইরানী।

সাঈদ ইরানী কুর্নিশ জানালো সাহেবী কায়দায়।

ইন্সপেক্টার রাজেন্দ্রনাথ এবং মিঃ ভৌম হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডসেক করলেন সাঈদ ইরানীর সঙ্গে।

তারপর অভয়কর বিশ্বাস দুর্বৃত্ত সম্বন্ধে সমস্ত বর্ণনা করলেন, শুধু চেপে গেলেন তিনি শ্রমিক সর্দার নাসির আলীর সম্পর্কে সব কথা। পুলিশ অফিসারদ্বয় ডায়েরী করে চললেন।

সাঈদ ইরানী গম্ভীর মুখে সব শুনলো। অভয়করের মিথ্যা উক্তি শ্রবণে এক টুকরা হাসির রেখা ফুটে উঠলো তার মুখে।

এবার সঈদ ইরানী উঠে দাঁড়ালো— চলি আবার দেখা হবে মিঃ বিশ্বাস, গুড্ নাইট্।

পুলিশ অফিসারদ্বয়ের সঙ্গে পুনরায় করমর্দন করলো সে; তারপর বেরিয়ে গেলো অফিস-রুম থেকে।

অফিস-রুমের অদূরেই সাঈদ ইরানীর প্লিমাউথ গাড়িখানা দাঁড়িয়েছিল। গাড়ির ড্রাইভ আসনে বসে ষ্টার্ট দিলো সে।

নাইট্ গার্ড লৌহগেট খুলে ধরলো, নির্বিঘ্নে বেরিয়ে গেলো সাঈদ ইরানীর বিরাট প্লিমাউথখানা।

বালিগঞ্জ হয়ে গাড়িখানা সোজা কালীঘাট অভিমুখে ছুটে চললো।

❑

কালীঘাট বজ্রবিহারী দেব শর্মার বাড়ির পিছনে এসে গাড়ি রেখে নেমে পড়লো সাঈদ; ইরানী কিন্তু এখন তার দেহে সম্পূর্ণ জমকালো পোশাক। মুখে কালো গালপট্টা, দক্ষিণ হস্তে রিভলভার।

বজ্রবিহারীর বিরাট বাড়ির দ্বিতল একটি কক্ষে তখনও আলো জ্বলছে।

জমকালো মূর্তি বাড়ির প্রাচীর বেয়ে উঠে গেলো উপরে, তারপর যে কক্ষে আলো জ্বলছিলো সে কক্ষের পিছনে পানির পাইপ বেয়ে দ্বিতলে এসে পৌঁছলো।

এ কক্ষ বজ্রবিহারী দেব শর্মার শয়নকক্ষ।

কলকাতার নামকরা 'ব্লাক মাচ্যান্ট' বজ্রবিহারী শর্মাকে সবাই চেনে। এমন একটা হৃদয়হীন জঘন্য মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে কেউ সমীহ না

করলেও তার পরম আত্মীয়ের অভাব হয় না। মানুষের সর্বনাশ করে দুটো পয়সা সংগ্রহ করতে তার এতোটুকু বাঁধতো না।

শুধু বজ্রবিহারী শর্মাই নয় এমনি আরও অনেক ব্যক্তিই আছেন যাদের নাম কালো মূর্তির মনের পাতায় লেখা হয়ে গিয়েছিলো।

মাসুদ ইরানীর ছোট ভাই সাঈদ ইরানীর বেশে কালো মূর্তি বজ্রবিহারী শর্মার শয়নকক্ষের পিছন শার্শীর পাশে এসে দাঁড়ালো।

বজ্রবিহারী তখন তার টেবিলে বসে টাকার গাঁদা নিয়ে হিসাব করছিলেন। রাতে কারবারের সমস্ত টাকা তিনি বাড়ি আনেন, পরদিন পাহারাদারসহ ব্যাঙ্কে গিয়ে জমা দিয়ে আসেন।

আজ প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা তিনি বাড়ি এনেছেন। সে টাকা গণনা করে গুছিয়ে রাখছিলেন বজ্রবিহারী শর্মা। কাল ভোরে ব্যাঙ্কে পাঠাবেন।

টাকা গণনা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় কালো মূর্তি আচম্‌কা প্রবেশ করলো তার কক্ষে।

বজ্রবিহারী চোখ তুলতেই কালোমূর্তি রিভলভার চেপে ধরলো তার বুকে—খবরদার , একটু শব্দ করবে তাহলেই গুলী করবো।

বজ্রবিহারীর চোখে মুখে ভীতিভাব ফুটে উঠলো। অস্ফুট ভয়ার্ত কণ্ঠে বললেন—কে তুমি?

আমি তোমার যম! দক্ষিণ হস্তে রিভলভার বজ্রবিহারীর বুকে চেপে ধরে বাম হস্তে টাকার ফাইলগুলো পকেটে তুলে নিলো কালোমূর্তি তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—কালোবাজারী কারবার বন্ধ না করলে আমাকে প্রতি সপ্তাহে তোমার লভ্যাংশের সম্পূর্ণ টাকা দিয়ে দিতে হবে। কোনোরকম চালাকি করলে বা পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করলে মৃত্যু অনিবার্য।

বজ্রবিহারী ঢোক গিলে বললো—তুমি, তুমি কে?

আমি হিতৈষী বন্ধু, যা বললাম স্মরণ রেখো---কথাটা বলে যেমন এসেছিলো তেমনি বেরিয়ে গেলো সচ্ছন্দে কালোমূর্তি।

বজ্রবিহারী শর্মা আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন—কে আছো ডাকাত ডাকাত---পুলিশ—পুলিশ---

বাড়ির বিভিন্ন কক্ষ থেকে ছুটে এলো সবাই, ঘিরে ধরলো বজ্রবিহারী শর্মাকে।

বজ্রবিহারী শর্মা তখন মাথায় করাঘাত করে বিলাপ করে বলছেন—হায়, আমার সব নিয়ে ডাকাত পালিয়েছে---

ততক্ষণে কালোমূর্তি তার গাড়িতে চেপে বসে ষ্টার্ট দিয়েছে।

সে রাত্রেই কালোমূর্তি আরও দু'টো জায়গায় হানা দিয়ে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা নিয়ে উধাও হয়। এ দু'টো ডাকাতি হয় হ্যারিসন রোডের দুটো মারোয়াড়ীর দোকানে। একটি সোনার দোকান অন্যটি ময়দার গুদামে!

❑

পরদিন পত্রিকায় ব্যাপারগুলো বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পেলো। কালীঘাটের বজ্রবিহারী শর্মা এবং মারোয়াড়ীদ্বয়ের দোকানের ডাকাতির সঙ্গে কালোমূর্তির আবির্ভাবজড়িত অদ্ভুত কাহিনী।

আরও প্রকাশ পেলো—অভয়কর বিশ্বাসের কোম্পানীর অফিস—রুমে কালোমূর্তি দস্যু প্রবেশ করে মিঃ বিশ্বাসের বিশ্বস্ত কর্মচারী ভীম সিংকে আহত করে অন্তর্ধান হয়েছে।

সমস্ত কলকাতা শহরের বুকে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। একি অদ্ভুত কাণ্ড! কোথা থেকেই বা আচমকা কালোমূর্তির আবির্ভাব হয়—আবার হানা দিয়ে সব লুটে নেবার পর কোথাই বা চলে যায়।

পুলিশ মহল সজাগ পাহারা দিয়েও কিছুই করতে পারছে না। শহরবাসিগণ এখন সদা আশঙ্কা নিয়ে যানবাহনে চলাফেরা করছে। কোন্ মুহূর্তে কোথায় কালোমূর্তি হানা দিয়ে বসবে কে জানে।

বনহুর প্রতিদিনের মত আজও পত্রিকাখানা তুলে নিলো হাতে। বাম হস্তের আঙ্গুলের ফাঁকে ধূমায়িত সিগারেট। আলগোছে দৃষ্টি বুলিয়ে চললো সে পত্রিকাখানার উপর। ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে উঠলো, মৃদু একটি হাসির রেখা ফুটে উঠলো তার ঠোঁটের কোণে।

❑

অভয়কর বিশ্বাসের হলঘর।

আজ সুন্দর করে সাজানো হয়েছে সমস্ত ঘরখানা। ফুলদানীতে সদ্য ফোটা রজনীগন্ধার থোকা শোভা পাচ্ছে। লোবানদানীতে সুগন্ধি লোবান মিষ্টিমধুর গন্ধ ছড়াচ্ছে। মার্জিত রুচিসম্পন্নভাবে সোফাসেটগুলো থরে থরে সাজানো।

অভয়কর বিশ্বাস নিজেও আজ তরুণ যুবকের বেশে সজ্জিত হয়েছে।

দক্ষিণ পার্শ্বের ডায়াসে পিয়ানো আর অর্কেষ্ট্রা বাদ্যযন্ত্রগুলো সাজানো। একটু পরেই গণ্যমান্য অতিথিগণ এসে পড়বেন। আজকের উৎসবের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ পিয়ানোবাদক মাসুদ ইরানী পিয়ানো পরিবেশন করবেন।

সন্ধ্যার পর থেকেই অতিথিগণ আসতে শুরু করলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বালিগঞ্জের চৌ-রাস্তার পাশে অভয়কর বিশ্বাসের বাড়ির সম্মুখে অসংখ্য গাড়ি ভীড় করে দাঁড়ালো। ষ্টুডি কমাণ্ডার, বুইক, কুইন, প্রেসিডেন্ট, মাষ্টার বুইক কত রকম গাড়িই না এসে পৌছলো আজ অভয়কর বিশ্বাসের বাড়ির সম্মুখস্থ রাস্তার পাশে।

অতিথিগণ সবাই আসন গ্রহণ করলেন।

অভয়কর বিশ্বাস গাড়ি-বারান্দায় পায়চারি করছেন, আমন্ত্রিত অতিথিগণ সবাই এসে গেছেন শুধু এখনও আসেননি আলবার্ড এবং তার ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্যালন।

আজকের উৎসবের মূল উদ্দেশ্যই আলবার্ড তার আশ্রিতা শ্যালনকে নিয়ে আসবেন তার বাড়িতে।

রাত বেড়ে আসছে।

সমস্ত অতিথিবৃন্দ উদ্বিগ্নভাবে অপেক্ষা করছেন। অর্কেষ্ট্রা বাদ্যযন্ত্রগুলোর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন বাদ্যকরগণ, শুধুমাত্র পিয়ানোবাদক মাসুদ ইরানী এখনও এসে পৌঁছায়নি।

কক্ষস্থ সবাই মাসুদ ইরানীর দর্শন লাভের আশায় উন্মুখ। তার নিপুণ হস্তের পিয়ানো বাজনা শুনতে পাবে এই যেন সকলের কামনা।

অভয়কর বিশ্বাসের কন্যা আরতীও আজকের আসরে যোগ দিয়েছে। সে পিতার কোনো ফাংশানে বড় বেশি আসতো না। আজ তার ইচ্ছা—মাসুদ ইরানীর পিয়ানো বাজানো শুনবে।

এক পাশে বসেছিলো আরতী। ধীর-স্থির-শান্ত লাবণ্যময়ী মেয়েটি যেন।

শুধুমাত্র তিনটি অতিথির জন্য এখনও টেবিলে খাবার দেওয়া হয়নি।

ডায়াসে অর্কেষ্ট্রা বাজতে শুরু করেছে। দুগ্ধধবল উজ্জ্বল টিউব লাইট থেকে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মি কক্ষটাকে স্বপ্নপুরীর মত মনোরম করে তুলেছে।

প্রত্যেকটা টেবিলে নারী-পুরুষ মিলে ঘিরে বসেছে। হাসি গল্প আর অর্কেষ্ট্রার সুর সৃষ্টি করেছে অভূতপূর্ব একটা পরিবেশ।

এমন সময় আলবার্ডের সঙ্গে কক্ষে প্রবেশ করলো শ্যালন। হাস্যোদ্দীপ্ত চঞ্চল মেয়েটি। শ্যাম্পু করা একরাশ কোঁকড়ানো চুল ছড়িয়ে আছে ঘাড়ের চারপাশে। লিপষ্টিক রঞ্জিত রক্তাভ দুটি চিকণ ওষ্ঠ। নীল উজ্জ্বল দুটি চোখ।

অভয়কর বিশ্বাস এদের অভ্যর্থনা করে বসালেন। তার মুখমণ্ডলে আনন্দোচ্ছ্বাস ফুটে উঠলো।

কিন্তু একি, এতোক্ষণেও এলোনা মাসুদ ইরানী, ব্যাপার কি!

ঠিক সে মুহূর্তে একখানা বিরাট প্লিমাউথ গাড়ি এসে থামলো অগণিত গাড়িগুলোর পাশে। গাড়ি থকে নেমে এলো দীর্ঘদেহী, বলিষ্ঠ সুঠাম দীপ্তকান্তি যুবক মাসুদ ইরানী। প্রবেশ করলো হলঘরে।

কক্ষস্থ সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো মাসুদ ইরানীর উপর। মাসুদ ইরানী কক্ষে প্রবেশ করেই মাথার ক্যাপ খুলে সবাইকে উদ্দেশ্য করে সাহেবী কায়দায় অভিনন্দন জানালো, তারপর এগিয়ে গেলো সে ডায়াসের দিকে।

ক্ষণিকের জন্য অর্কেষ্ট্রা থেমে গেলো।

মাসুদ ইরানী ডায়াসে পিয়ানোর সম্মুখে এসে বসলো। টিউব লাইটের উজ্জ্বল আলোতে মাসুদ ইরানী কক্ষমধ্যে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো,

তারপর হাত রাখলো পিয়ানোর রীডে। অপূর্ব এক সুরের ঝঙ্কারে মুখর হয়ে উঠলো সমস্ত কক্ষটা।

অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রগুলোও বেজে উঠলো পিয়ানোর সঙ্গে যোগ দিয়ে।

কক্ষস্থ সবাই মুগ্ধ হয়ে গেলো। তন্ময় হয়ে শুনছে সবাই এ সুরের সংযোজন।

টেবিলে খাদ্যসম্ভার দেওয়া হলো।

খেতে শুরু করলেন সম্ভ্রান্ত অতিথিবৃন্দ।

ওদিকের একটা টেবিলে আলবার্ড আর শ্যালন বসেছিলো। তাদের পাশেই বসেছিলেন অভয়কর বিশ্বাস। মাঝে মাঝে তিনি শ্যালন আর আলবার্ডের সঙ্গে কিছু আলাপ-আলোচনা করছিলেন।

মাসুন ইরানীর মন পিয়ানোর মধ্যে সংশ্লিষ্ট থাকলেও দৃষ্টি তার শ্যালনকে আকৃষ্ট করছিলো। আর কখনও কখনও নজর চলে যাচ্ছিলো তার অজ্ঞাতেই দক্ষিণ কোণে সোফায় উপবিষ্ট তরুণীর উপর।

তরুণী অভয়কর বিশ্বাসের কন্যা আরতী।

মাসুদ ইরানীর পিয়ানো থেমে যায়।

করতালিতে মুখর হয়ে উঠে হলঘর।

মাসুদ ইরানী উঠে মাথার ক্যাপ খুলে সকলের আনন্দধ্বনির জবাব দেয়। হঠাৎ তার দৃষ্টি চলে যায়, শ্যালন নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

মাসুদ ইরানীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয়।

কিন্তু মাসুদ ইরানী আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে—ওদিকের সোফায় বসেছিলো যে তরুণী সে কখন চলে গেছে তার আসন ত্যাগ করে। সে বুঝতে পারে তরুণী শুধু তারই পিয়ানো শোনার অপেক্ষাতেই ছিলো। যেমন পিয়ানো বাজানো শেষ হয়েছে তেমনি সরে গেছে সে। কে এ তরুণী যে শুধু পিয়ানো শোনার জন্যই এ ফাংশনে যোগ দিয়েছিলো? অভয়করের সঙ্গে কি তার সম্বন্ধ?

ফাংশান শেষ হয়।

সম্মানিত অতিথিগণ বিদায় গ্রহণ করেন।

শুধু এখনও আলবার্ড শ্যালনকে নিয়ে বসে রয়েছেন তার নির্দিষ্ট সোফায়।

বাজনাওয়ালারা সবাই চলে গেছে।

মাসুদ ইরানীও চলে গেছে কিছু পূর্বে।

অভয়কর বিশ্বাসের গাড়ি-বারান্দায় তখনও আলবার্ডের গাড়িখানা অপেক্ষা করছে।

বিরাট হলঘরটা শুধুমাত্র এখন তিনটি প্রাণী—আলবার্ড, শ্যালন এবং অভয়কর বিশ্বাস।

আলবার্ডের সঙ্গে অভয়কর বিশ্বাসের ইঙ্গিতে কিছু কথা হলো।

শ্যালন বাড়ি ফেরার জন্য চঞ্চল হয়ে পড়েছে।

এমন সময় বয় তিন কাপ চা এনে টেবিলে রাখলো।

অভয়কর বিশ্বাস এক কাপ আলবার্ডের হাতে দিয়ে দ্বিতীয় কাপ শ্যালনকে দিলেন—চা খেয়ে তারপর বাড়ি যেও।

শ্যালন বাড়ি ফেরার আনন্দে চায়ের কাপটা হাতে নেয়।

অভয়কর বিশ্বাস তৃতীয় কাপ তুলে নিয়ে চুমুক দেন।

আলবার্ড এবং শ্যালনও চায়ের কাপে চুমুক দিলো।

চা-পান শেষ না হতেই শ্যালন ঢলে পড়লো তার সোফায়। আলবার্ড আর অভয়কর বিশ্বাসের দৃষ্টি বিনিময় হলো।

আলবার্ড উঠে পড়লেন।

অভয়কর তাকে গাড়ি অবধি পৌছে দিয়ে ফিরে এলেন। শ্যালনের সংজ্ঞাহীন দেহটাকে হাতের উপর তুলে নিয়ে পাশের কামরায় নিজের শয্যায় শুইয়ে দিলেন।

দরজা বন্ধ করে ফিরে গেলেন তিনি নিজ শয্যার পাশে। শ্যালনের সুন্দর ফুলের মত দেহটা দুগ্ধধবল বিছানায় ছিন্নলতার মত পড়ে আছে। অভয়কর বিশ্বাস খাটের পাশে বসে পড়লেন। উজ্জ্বল বিদ্যুতের আলোতে নিষ্পলক নয়নে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন শ্যালনের যৌবনভরা দেহটার দিকে। তারপর দক্ষিণ হাতখানা রাখলেন সংজ্ঞাহীন শ্যালনের কোমল গণ্ডের উপর। ধীরে ধীরে ঝুকে এলো তাঁর মাথাখানা নীচের দিকে।

ঠিক সে মুহূর্তে পিঠে অনুভব করলেন অভয়কর বিশ্বাস একটা হিমশীতল কঠিন বস্তুর ছোঁয়া। চমকে সোজা হলেন তিনি, ফিরে তাকাতেই আড়ষ্ট হয়ে গেলেন, জমকালো মূর্তি তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে, তার হস্তের রিভলভারের ছোঁয়াই পিঠে হিমশীতল কঠিন পরশ দিয়েছে।

জমকালো মূর্তি বললো এবার—পাপাত্মা, একটা নিষ্পাপ জীবনকে তুমি বিনষ্ট করতে যাচ্ছো! জানো এর শাস্তি কি?

ফ্যাকাশে মুখে বলে উঠেন অভয়কর বিশ্বাস—এ ঘরে তুমি কি করে প্রবেশ করলে?

লৌহসিন্দুকেও যমের প্রবেশ অসাধ্য নয়।

তুমি----

হাঁ, আমি তোমার যম!

কি চাও তুমি আমার কাছে? কত টাকা চাও?

আজ টাকা নয়, এ নিষ্পাপ যুবতীকে তোমার কবল থেকে উদ্ধার করতে চাই।

না। আমি কিছুতেই একে দেবো না।

দেবে না?

না, আলবার্ডের নিকট হতে একে আমি খরিদ করেছি। কোটি টাকার বিনিময়ে---

তোমার জীবনের মূল্য ক' কোটি টাকা হতে পারে?

কে তুমি?

আমি তোমার হিতৈষী বন্ধু।

যদি হিতৈষী বন্ধু হও তাহলে—তাহলে চলে যাও। যত টাকা চাও তাই দেবো। শ্যালনকে আমার চাই।

তোমার সমস্ত ঐশ্বর্যের বিনিময়েও তুমি ওকে পাবে না। দাঁতে দাঁত পিষে বললো কলো মূর্তি।

এতে তোমার স্বার্থ? বললেন অভয়কর।

হাসলো কালোমূর্তি—হিতৈষী বন্ধু কোনোদিন স্বার্থ নিয়ে কাজ করে না। কালোমূর্তির হস্তে তখনও উদ্যত রিভলভার অভয়কর বিশ্বাসের বুক লক্ষ্য করে স্থির রয়েছে।

অভয়কর বিশ্বাস ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছেন একবার জমকালোমূর্তির কালো আবরণে ঢাকা মুখখানার দিকে, আর একবার তাকাচ্ছেন তার হস্তের উদ্যত রিভলভারের দিকে।

বিছানায় সংজ্ঞাহীন শ্যালন পড়ে আছে।

এবার কালোমূর্তি তার পকেট থেকে সিল্ক কর্ড বের করে অভয়কর বিশ্বাসকে মজবুত করে বেঁধে ফেললো, আর একখানা রুমাল গুঁজে দিলো তাঁর মুখের মধ্যে। শ্যালনের পাশে বিছানায় ওঁকে শুইয়ে দিয়ে শ্যালনকে তুলে নিলো কাঁধে।

❑

শ্যালনকে পিছন আসনে শুইয়ে দিয়ে ড্রাইভ আসনে উঠে বসলো কালোমূর্তি। এবার উল্কা বেগে গাড়ি ছুটতে শুরু করলো। গাড়িতে বসেই কালোমূর্তি তার জমকালো পোশাক খুলে ফেললো। লুকিয়ে রাখলো ড্রাইভিং আসনের নীচে।

কিছুক্ষণ এ—পথ সে—পথ করে ঘুরে ফিরলো তারপর গঙ্গাতীরে এসে গাড়ি রাখলো একটা নির্জন স্থান দেখে নিয়ে। ড্রাইভিং আসন থেকে নেমে পিছন আসনে উঠে বসলো। গাড়ির ভিতরে সুইচ টিপে আলোটা জ্বেলে নিলো সে। শ্যালনের সংজ্ঞাহীন মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে দেখলো, এখনও জ্ঞান ফিরে আসেনি।

যতক্ষণ শ্যালনের জ্ঞান ফিরে না আসে ততক্ষণ তাকে গঙ্গা তীরেই অবস্থান করতে হবে। আলো নিভিয়ে দিলো সে। না হলে গঙ্গাতীরস্থ কোনো ব্যক্তি হঠাৎ যদি এসে পড়ে—বিভ্রাট ঘটবে।

অন্ধকারে শ্যালনের পাশে নিজেকে ধরে রাখাও উচিৎ মনে করলো না, কারণ সে নারী নয়—পুরুষ। একটা সংজ্ঞাহীন অসহায় যুবতীর পাশে সে

একজন উচ্ছল তরুণ যুবক। নিজেকে সংযত করে নিয়ে ড্রাইভিং আসনে এসে বসলো। সিগারেটের পর সিগারেট নিঃশেষ করে চললো সে।

অন্ধকারে গঙ্গার শীতল বাতাসে হাড়ে যেন কাঁপন আসছে।

হঠাৎ পিছন আসনে নড়ে উঠলো শ্যালন, একটা অস্পষ্ট শব্দ করলো, মা---মাগো---উঃ----

খুশীতে উজ্জ্বল হলো ওর মুখ, তাড়াতাড়ি হস্তস্থিত সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পিছন আসনে উঠে বসলো।

কে—কে তুমি! বললো শ্যালন।

সুইচ টিপে আলো জ্বালাতেই শ্যালন অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করলো—আলম তুমি।

আলম নই—দস্যু বনহুর।

না, না, তুমি দস্যু নও---শ্যালন বনহুরের বুকে মুখ গুঁজলো।

❑

বাধ্য হলো বনহুর গাড়ির ভিতরের আলো নিভিয়ে দিতে।

শ্যালনকে নিয়ে বনহুর গ্র্যাণ্ড হোটেলে এসে উঠলো। মিঠু ঘুমিয়ে পড়েছিলো, মনিবের ডাকে জেগে উঠে অবাক হলো। মনিবের সঙ্গে একটি যুবতীকে দেখে প্রশ্ন করে বসলো সে—স্যার, ইনি কে?

বনহুর শরীর থেকে জামাটা খুলতে খুলতে বললো—আমার বোন। দেশ থেকে এসেছে, ক'দিন এখানেই থাকবে।

এবার মিঠু খুশী হলো, হেসে বললো—ঠিক আপনার মতই দেখতে কিন্তু স্যার।

শ্যালন বনহুরের জবাবে খুশী হলো কিনা বোঝা গেলো না। যেমন নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে ছিলো তেমনি রইলো।

মিঠু বললো—স্যার, খাবার টেবিলে ঢাকা রয়েছে।

ওসবে প্রয়োজন হবে না। তুই এবার শুবি যা মিঠু।

মিঠু চলে গেলো।

শ্যালন তখনও দাঁড়িয়ে, মনের মধ্যে তার নানা চিন্তা জট পাকাচ্ছিলো।

বনহুর স্লিপিং গাউন গায়ে দিয়ে ফিরে তাকায়—কি ভাবছো শ্যালন?

শ্যালন জবাব দেয়—ভাবছি আলবার্ড কাকার নির্মম জঘন্য আচরণের কথা।

সে কারণেই আমি তোমাকে আর পার্ক-সার্কাস তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলাম না। অভয়কর বিশ্বাস আবার তোমার উপর আক্রমণ চালাতে কসুর করতেন না।

আলম, আমি আর সেখানে ফিরে যাবো না। সত্য বলছি, প্রাণ থাকতে কিছুতেই আমি ও-বাড়িতে যাবো না।

কিন্তু---

আমাকে হত্যা করলেও না। ইস, কি ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে আজ তুমি আমাকে বাঁচিয়ে নিয়েছো।

শ্যালন, কিন্তু আমার কাছেই বা তুমি থাকবে কি করে?

কেন? ম্লান মুখে তাকালো শ্যালন বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর শ্যালনকে তার শয্যার পাশে বসিয়ে দিয়ে বললো— আমি বন্ধনহীন একটি প্রাণী। আমার কাছে থাকা তোমার মোটেই নিরাপদ হবে না।

আলম, তাহলে বলো আমি কোথায় যাবো?

বনহুর দরজা বন্ধ করে ফিরে এলো, শ্যালনের পাশে ঘনিষ্ঠ হলে বললো—আমাকে যেমন বিশ্বাস করো তেমনি কাউকে কি করতে পারোনা?

তোমাকে ছাড়া আমি কাউকে বিশ্বাস করিনে আলম। আমি কাউকে বিশ্বাস করিনে। শ্যালন বনহুরের কণ্ঠ বেষ্ঠন করে ধরে।

বনহুর শ্যালনের মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেয়। বলে—বেশ, তুমি থাকবে আমার কাছে, কিন্তু---

না না কোনো কিন্তু নয়, আমাকে তুমি দূরে ঠেলে দিও না।

কথার মাঝে আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে শ্যালন। কিছুক্ষণেই বনহুর বুঝতে পারল--তার বুকের উপর মাথা রেখে শ্যালন ঘুমিয়ে পড়েছে।

বনহুর ধীরে ধীরে শ্যালনকে তার বিছানায় শুইয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, একখানা চাঁদর ঢাকা দিলো ওর দেহে। তারপর নিজে গিয়ে শুয়ে পড়লো ডবল সীটের একটা সোফায়।

❑

ভোরে ঘুম ভেংগে গেলো শ্যালনের, বিছানায় উঠে বসতেই নজর পড়লো সোফায়। সোফার হাতলে মাথা রেখে অঘোরে ঘুমাচ্ছে আলম। হাত দু'খানা বুকের উপরে রয়েছে।

কাঁচের শার্শী দিয়ে প্রভাতের সূর্যের আলো কক্ষটাকে উজ্জ্বল করে তুলেছিলো। শ্যালন নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো বনহুরের বলিষ্ঠ সুন্দর ঘুমন্ত মুখের দিকে।

শ্যালন নিজেকে হারিয়ে ফেলে, ভুলে যায় সে আপন সত্তা। ঝুকে পড়ে সে বনহুরের পুরু দুটি ঠোঁটের উপর।

ঘুম ভেংগে যায় বনহুরের, নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে বলে—একি করছো শ্যালন?

আলম, আমাকে একা ফেলে তুমি সোফায় শুয়েছিলে কেনো? বলো জবাব দাও?

তুমি তো অবুঝ নও! ছিঃ সরে যাও শ্যালন, মিঠু এসে পড়বে।

পড়ক। কোমল বাহু দুটি দিয়ে বনহুরের কণ্ঠ বেষ্ঠন করে ধরে শ্যালন, ব্যাকুল আগ্রহে মুখখানা বাড়িয়ে দেয় সে।

বনহুর বলে—উঁ হুঁ। শ্যালনের বাহু দুটি মুক্ত করে দিয়ে উঠে।

এমন সময় মিঠু দরজায় ডাকে—স্যার!

দরজা খুলে দেয় বনহুর—কি-রে মিঠু?

স্যার, অনেক বেলা হয়ে গেছে।

বনহুর সোফায় বসে সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে।

শ্যালন তখন বাথরুমে প্রবেশ করেছে।

বনহুর সোফায় হেলান দিয়ে সিগারেট পান করছিলো, তাকিয়ে ছিলো সে আনমনে করিডোরের দিকে। ভাবছিলো গুরুত্বপূর্ণ কথা। এভাবে শ্যালনের সঙ্গে এক কক্ষে বাস করা আর কিছুতেই সম্ভব নয়। নিজেকে সে কতক্ষণ সংযত রাখতে পারবে। বিশেষ করে শ্যালনের যৌবন—ভরা লোভনীয় দেহটাকে কতক্ষণ সে উপেক্ষা করে চলতে পারবে। পায়চারি শুরি করে বনহুর, আজকেই তাকে এ হোটেল ত্যাগ করে চলে যেতে হবে।

এমন সময় মিঠু পত্রিকাখানা রেখে যায় টেবিলে। বনহুর সোফায় বসে পত্রিকাখানা তুলে নেয় হাতে। আজ অন্যান্য খবরে দৃষ্টি না দিয়ে প্রথমে নজর বুলায় সে বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়। বাড়ি ভাড়ার বিজ্ঞপ্তিগুলোর উপর দৃষ্টি বুলিয়ে চলে। হঠাৎ খুশী হয় সে, "হাওড়া শালকিয়া এলাকায় গঙ্গার ধারে একটি ছোট্ট বাংলো প্যাটার্ণ বাড়ি ভাড়া দেয়া হবে"। ঠিকানা, এবং ফোন নাম্বার নীচে রয়েছে।

বনহুর কাগজখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে পড়লো।

শ্যালন তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলো বাথরুম থেকে, বললো—কি ব্যাপার? পত্রিকাখানা অমন করে ছুঁড়ে ফেলে দিলে কেন?

নতুন কোনো সংবাদ নেই। কথাটা অবশ্য মিথ্যা, কারণ বনহুর পত্রিকায় ভালভাবে লক্ষ্যই করেনি।

শ্যালন পত্রিকাখানা হাতে তুলে নিতেই অস্ফুট ধ্বনি করলো—দেখেছো, আজও আবার সে জমকালো মূর্তির আবির্ভাব!

হুঁ! কোথায়? বনহুর স্লিপিং গাউনের বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে বললো।

শ্যালন পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় লক্ষ্য করে বললে—অভয়কর বিশ্বাসের বাড়িতে। কালোমূর্তি মিঃ বিশ্বাসকে নাকি বেঁধে তার সর্বস্ব নিয়ে উধাও হয়েছে। ইতিপূর্বে আরও দু'বার এ কালো মূর্তি তার বাড়িতে এবং কারখানার অফিসে হানা দিয়েছে।

বনহুর ঝুকে পড়লো, পত্রিকায় দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললো—ডাহা একটা মিথ্যে কথা বলেছে বিশ্বাস!

মিথ্যে, কি করে বুঝলে আলম?

না না কিছুনা। কাল রাতে তোমাকে নিয়ে আসার পর তাহলে কালোমূর্তি হানা দিয়েছিলো বলে মনে হচ্ছে।

শ্যালন এবার প্রশ্ন করলো—এতোবড় শহরটার বুকে একটা কালো মূর্তি রোজ এভাবে লোকচক্ষুর সম্মুখে লুটতরাজ করে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে উধাও হবে আর পুলিশ তাকে ধরতে পারবে না—সত্যি বড় আশ্চর্য!

বনহুর সোজা হয়ে দাঁড়ালো—শ্যালন, কালোমূর্তি গ্রেপ্তার হলে তুমি খুশী হও?

বা রে খুশী হবো না মানে! খুব খুশী হবো।

তাহলে অভয়করের হাত থেকে তোমার উদ্ধার চিরতরে মিটে যেতো।

কেন? কেন?

কালোমূর্তিই তোমায় উদ্ধার করেছে শ্যালন।

তবে যে বললে তুমি?

হাঁ, কালোমূর্তির সহায়তা ছাড়া আমার কোনো উপায় ছিলো না। একটু থেমে বললো, সে—শ্যালন, তুমি অপেক্ষা করো, আমি বাইরে যাবো।

সেকি, আমাকে সঙ্গে নেবে না?

না।

কোথায় যাবে?

পরে বলবো।

❑

হাওড়া।

শালকিয়া এলাকায় গঙ্গার ধারে সুন্দর বাংলো প্যাটার্ণের একখানা বাড়ি।

বনহুর এ বাড়িই ভাড়া নিলো তার থাকার জন্য। তাই বলে সে গ্র্যাণ্ড হোটেল থেকে বিদায় নিয়ে এলো না। সেখানেও ঠিক পূর্বের মতই রয়ে গেলো। তবে মিঠুকে সব সময় তার কামরাটা পাহারা দিয়ে রাখতে হতো। কারণ, বনহুর প্রায় রাতই হোটেলে ফিরতোনা।

শ্যালনকে প্রথম দিন বনহুর বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলো। মস্ত বড় বাড়ি, পাশাপাশি বেশ কয়েকখানা কামরা। বনহুর যে কামরায় থাকতো তার পাশের কামরাই ছিলো শ্যালনের জন্য।

কিন্তু শ্যালন যাতে বুঝতে না পারে সে তাকে এড়িয়ে চলার জন্যই এ ব্যবস্থা করেছে। বনহুর বলেছিলো—সব সময় হোটেলে থাকা সম্ভব নয়, বিশেষ করে তোমাকে নিয়ে—তাই এ বাড়িটা ভাড়া নিলাম।

গঙ্গাতীরে সুন্দর মনোরম বাড়ি।

খুশীই হলো শ্যালন।

এখানে তার নেই কোনো ভয়-ভীতি আর আশঙ্কা। কিন্তু একটা উদ্বিগ্নতা এখন তার মনে অহরহ জেগে রয়েছে। সদা ভয় তার আলমকে নিয়ে। বাইরে গেলে আর সহজে ফিরবার কথা নেই।

শ্যালন একা একা বাড়িটায় যেন হাঁপিয়ে পড়ে।

আজ সপ্তাহ হলো এ বাড়িতে এসেছে, একটি দিন আলমকে সে একান্ত নিভৃতে পায়নি। বাড়ির চাকর-বাকর আর বাবুর্চি ছাড়া কেউ থাকতো না বা কাউকে পেতো না সে।

আলম ফিরতো, কিন্তু গভীর রাতে যখন শ্যালন নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে তখন। মাঝের দরজায় আলম খিল এঁটে দিয়ে ঘুমাতো ঘুম ভেংগে গেলেও সে ওর নাগাল পেতো না। শ্যালন যেন হাঁপিয়ে পড়ছিলো দিন দিন।

❑

সেদিন বনহুর ভোরে বাথরুম থেকে বের হতেই শ্যালন গিয়ে ধরে বসলো—আজ তোমাকে কোথাও যেতে দেবোনা আলম।

বনহুরের মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো, বললো—শ্যালন, আজ না গিয়ে যে কোনো উপায় নেই।

কোথায় যাবে তুমি?

আজ ষ্টার থিয়েটার হলে মাসুদ ইরানী পিয়ানো বাজাবে।

মাসুদ ইরানী! শ্যালন আনন্দধ্বনি করে উঠলো। তারপর বললো—তুমিও বুঝি মাসুদ ইরানীর পিয়ানো শুনতে ভালবাসো?

খুব!

সত্যি, আমার কাছে অপূর্ব মনে হয়!

মাসুদ ইরানী, না তার পিয়ানোর সুর? কোন্‌টা?

দু'টোই! মাসুদ ইরানী সত্যিই অদ্ভুত মানুষ।

বনহুর কোনো কথা বললো না।

শ্যালন বনহুরের মুখটা নিজের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে বললো— রাগ করলে নাতো?

অভিমানের সুরে বললো বনহুর—মাসুদ ইরানীর তুলনায় আমি তো নগণ্য একটি মানুষ--

ছিঃ, আমি সে কথা বলিনি। মাসুদ ইরানীর পিয়ানো আমার ভাল লাগে তাই।

বেশ, মাসুদ ইরানীর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবো।

সত্যি বলছো?

হাঁ।

কিন্তু আজ আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।

কোথায়?

ষ্টারে, মাসুদ ইরানীর পিয়ানো শুনতে।

কিন্তু অভয়কর বিশ্বাস বা তাঁর লোক যদি তোমায় দেখে ফেলে?

থাক্ আমি যাবোনা! শ্যালনের মুখখানা বিমর্ষ-বেদনাময় হলো।

বনহুর ওকে কাছে টেনে নিলো, আবেগ ভরা কণ্ঠে বললো— শ্যালন, মাসুদ ইরানীকে যদি আমার বাংলোয় নিয়ে আসি খুশী হবে তুমি?

ডাগর ডাগর চোখ দুটি তুলে তাকালো শ্যালন বনহুরের মুখে, ওর কথা যেন বিশ্বাস হচ্ছেনা। মাসুদ ইরানী আসবে তার এখানে— অসম্ভব এ কথা। বললো শ্যালন—শুনেছি মাসুদ ইরানীর অনেক টাকা ফি?

টাকার জন্য ভেবো না শ্যালন, তোমার নাম বললে মাসুদ ইরানী না এসেই পারে না।

তাহলে তোমাকে ছেড়ে দিলাম, কিন্তু সকাল সকাল ফিরবে। বড্ড রাত করে বাসায় আসো, আমি রোজ ঘুমিয়ে পড়ি।

হাঁ, তুমি আমার জন্য অপেক্ষা না করে ঘুমাবে, আর শোনো, চারপাশের দরজা ভাল করে বন্ধ করে শোবে।

শ্যালন বনহুরের কথামত কাজ করে। সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী মেয়ে সে নয়। বনহুর ওকে ভয় দেখিয়েছে—ফাঁক পেলেই কালোমূর্তির আবির্ভাব ঘটতে পারে, কাজেই তুমি সাবধান থাকবে।

সে রাতে বনহুর ষ্টার থিয়েটার হলে বিনোদ বিহারী নামক এক ধনকুবেরের স্ত্রীর কণ্ঠ থেকে লক্ষ টাকা মূল্যের হার হরণ করে। আরও এক মহাজনের আড়ত থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে উধাও হয়।

একই রাতে দুটো রহস্যজনক ডাকাতি।

❑

পরদিন।

বনহুর ঘুমিয়ে আছে, বেলা প্রায় ন'টা বাজতে চলেছে। তবু তার নিদ্রাভংগের কোনো লক্ষণ নেই।

শ্যালন ব্যস্তসমস্ত হয়ে প্রবেশ করলো তার কক্ষে। হস্তে তার দৈনিক সংবাদপত্র। বনহুরের পাশে বসে হন্তদন্ত হলে ডাকলো—আলম, আলম---

উঁ বলে পাশ ফিরলো বনহুর।

শ্যালন ওকে ঝাকুনি দিয়ে পুনঃ পুনঃ ডাকতে লাগলো—উঠো। উঠো দেখো---

হাই তুলে উঠে বসলো বনহুর—উঃ বড্ড জ্বালাতন করে মারলে শ্যালন।

শ্যালন চঞ্চল কণ্ঠে বললো—এই দেখো। পত্রিকাখানা মেলে ধরলো তার সামনে।

কি ব্যাপার বলোই না? চোখ তুলে তাকালো বনহুর।

শ্যালন বললো—কাল রাতে তুমিও তো গিয়েছিলে ষ্টার থিয়েটার হলে মাসুদ ইরানীর পিয়ানো শুনতে। শুনেছিলে কিছু?

কই না তো? কেন কি হয়েছে?

"অসংখ্য জনতার মধ্যে বিস্ময়কর চুরি"

তার মানে?

গতরাতে নামকরা মহাজন বিনোদ বিহারী চন্দ্রের স্ত্রীর কণ্ঠ থেকে মূল্যবান হার–চুরি গেছে। তুমিও তো গিয়েছিলে ষ্টারে, শোনোনি কিছু?

আমি কি হার চুরি সংবাদ শুনতে গিয়েছিলাম? যখন হার চুরি হয় তখন আমি মাসুদ ইরানীর পিয়ানোর মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম--সত্যি অপূর্ব! বনহুর শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়।

শ্যালন বলে আবার—এই দেখো, আরও একজন ব্যবসায়ীর আড়ত থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা হরণ---

এ সব আমাকে শোনাচ্ছো কেন শ্যালন?

সত্যি, এতোবড় একটা শহরে প্রতিদিন এমনি চুরি-ডাকাতি হচ্ছে অথচ পুলিশ কিছু করতে পারছে না। আমার কিন্তু ভয় হয় তুমি কত রাত বাইরে থাকো---

তুমি কি মনে করো এসব চুরি-ডাকাতি আমিই করছি?

ছিঃ ও কথা কে বলছে বলো? তুমি বাইরে থাকো আমি একা বাসায় থাকি—ভয় হয় কখন কোন্ পথে চোর ঢুকে---

তোমাকে হরণ করে নিয়ে যাবে—এই তো ভয়?

ঠিক তা নায়।

তবে?

তোমার প্রশ্নের জ্বালায় বাঁচিনে। যাও তো বাথরুমে হাত মুখ ধুয়ে এসো, টেবিলে চা এসে গেছে।

বনহুর শ্যালনের বাধ্য ছাত্রের মত বাথরুমে প্রবেশ করে। আপন মনেই হাসে বনহুর, শ্যালনই শুধু জানে—আলম দস্যু বনহুর। কলকাতার বুকে সে ছাড়া আর দ্বিতীয় প্রাণী কেউ জানে না তার আসল পরিচয়। কিন্তু এতো জেনেও শ্যালন আলমকে অবিশ্বাস করতে পারে না কোনোদিন। কারণ, যাকে ভালবাসা যায় তাকে নাকি অসৎ ভাবা যায় না।

শ্যালনের অবস্থাও তাই, সে ভাবতে পারে না আলম কলকাতার বুকে আতঙ্ক সৃষ্টি করে চলেছে। সে ভাবতেও পারে না—আলম একজন দুর্দান্ত দস্যু।

আলমকে সে শুধু ভালই বাসে না—মনপ্রাণ দিয়ে সমীহ করে, বিশ্বাস করে তাকে। আলমের মত আর কাউকে বুঝি এতোখানি সে সমীহ করেনি কোনোদিন।

পুলিশ মহল এ কালোমূর্তির আবির্ভাব নিয়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে পড়েছে। আজ এখানে কাল সেখানে সব সময় কালোমূর্তি হানা দিয়ে লক্ষ লক্ষ অর্থ হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে অথচ পুলিশ বা গোয়েন্দা বিভাগ কিছুই করতে পারছে না। সমস্ত শহরময় একটা আতঙ্কভাব ছড়িয়ে আছে সর্বক্ষণ। ট্রাম, বাস বা যে কোনো যানবাহনে সদা ঐ কালোমূর্তির আবির্ভাব নিয়ে আলোচনা চলছে।

যতদূর সম্ভব সবাই সতর্ক হয়ে চলাফেরা করছে। কিন্তু এতেও রেহাই নেই, কালোমূর্তি ঠিকভাবেই তার কাজ চালিয়ে চলেছে।

সবচেয়ে বেশি আক্রোশ যেন কালোমূর্তির অভয়কর বিশ্বাসের উপর। ইতিমধ্যে কালোমূর্তি হানা দিয়ে তাঁর সিমেন্ট কারখানার সমস্ত কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলো, সিমেন্টে কোনোরকম ভেজাল চলবে না। যে শ্রমিক ভেজাল সিমেন্ট তৈরি ব্যাপারে কারখানার কাজ করবে তাকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে। তাছাড়া শ্রমিক সর্দার নাসির আলীর উপর আদেশ ছিলো, যতক্ষণ কারখানায় আসল সিমেন্ট তৈরির হুকুম না দেয়া হবে ততক্ষণ বা ততদিন ধর্মঘট সমানে চলতে থাকবে। বনহুর নিজে বস্তিতে গিয়ে শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ দেখে প্রচুর অর্থ দিয়ে আসতো, কারণ তারা যেন ক্ষুধার তাড়নায় অন্যায় কাজে প্রবৃত্ত না হয়।

অভয়কর বিশ্বাস প্রতিটি কাজে বাধা পেতে লাগলেন। সিমেন্ট কারখানার কাজ বন্ধ হয়ে গেলো প্রায়। অন্যান্য কোম্পানীগুলোও শিথিল হয়ে এলো। শ্রমিকের দল ধর্মঘটের পর ধর্মঘট চালিয়ে চলেছে। নাসির আলীর উপর যে কোনো কর্মচারী অত্যাচার চালাবে তাকেই কালোমূর্তি চরম শাস্তি দেবে— কেউ ভয়ে নাসির আলীকে কিছু বলতে সাহসী হয় না।

অভয়কর বিশ্বাস নাসির আলী সম্বন্ধে পুলিশে রিপোর্ট দিতে গিয়েছিলেন কিন্তু পারেন নি। কালোমূর্তি তাকে মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে সে পথ বন্ধ করে দিয়েছে। ভীম সিং তার দক্ষিণ হাতখানা চিরতরে হারিয়ে অকেজো হয়ে পড়েছে। ভীম সিং এর মত একজন বিশ্বস্ত অনুচরের এ চরম অবস্থার জন্য অভয়কর বিশ্বাস মুষড়ে পড়েছিলেন। আরও বেশি তিনি ভেংগে পড়েছেন শ্যালনকে হারিয়ে। আলবার্ডের কাছেও তিনি অনেক হেয় হয়ে গেছেন। আলবার্ড দুটো কথা শোনালেও অভয়কর কোনো জবাব দিতে পারেন না। কারণ, শ্যালনকে তিনি সামলে রাখতে সক্ষম হননি। শ্যালন সম্বন্ধে পুলিশে ডায়রী দেওয়াও সমীচীন নয় ভেবে এ ব্যাপারেও তিনি ক্ষান্ত রয়েছেন। অভয়কর বিশ্বাস জানেন, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে যেতে পারে কাজেই নিশ্চুপ থাকাই মঙ্গল।

অভয়কর বিশ্বাস কালোমূর্তির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। বাধ্য হয়েই তিনি সিমেন্ট কারখানায় নির্ভেজাল সিমেন্ট তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু কথায় বলে, যে কুকুরের লেজ বাঁকা, সো হাজার ইট পাটকেল বেঁধে দিলেও সোজা হয় না।

অভয়কর বিশ্বাসের কারখানায় ভেজালশূন্য সিমেন্ট তৈরি হলেও এবার পুরাদমে শুরু হলো ব্লাকমার্কেট। তার কারখানা থেকে হাজার হাজার ব্যাগ সিমেন্ট চোরাচালানিভাবে জাহাজ বোঝাই হয়ে গোপনে চলে যেতে লাগলো বিদেশে।

গোয়েন্দা বিভাগ নিপুণ সতর্কতা সত্ত্বেও অভয়কর বিশ্বাসের চোরা কারবারের কিছুমাত্র প্রতিরোধ করতে পারলেন না।

বনহুর সব সন্ধান পেলো।

এবার তার চোরাচালানি একেবারে বন্ধ করে দেবার জন্য সে প্রস্তুতি নিলো।

❑

একদিন অভয়কর বিশ্বাস তাঁর গাড়িতে বাড়ি ফিরছিলেন। খিদিরপুর তার কোম্পানী থেকেই ফিরছিলেন তিনি। তার ড্রাইভার যতীন গাড়ি চালিয়ে চলেছে।

একটা নির্জন গলি-পথে গাড়িখানা অগ্রসর হচ্ছিলো। হঠাৎ গাড়িখানা থেমে যায়, ড্রাইভার যতীনের বেশে গাড়ি চালাচ্ছিলো দস্যু বনহুর। আচমকা বনহুর রিভলভার বের করে চেপে ধরে অভয়কর বিশ্বাসের বুকে। গম্ভীর চাপা কণ্ঠে বলে—জীবন না অর্থ—কোন্‌টা তুমি চাও?

কে তুমি? বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন অভয়কর বিশ্বাস।

আমি তোমার সে হিতৈষী বন্ধু।

কি চাও আজ তুমি আমার কাছে?

চোরা কারবার বন্ধ করতে হবে, নচেৎ মৃত্যুবরণ করবে। বলো কোন্‌টা চাও?

অভয়কর বিশ্বাস নীরব।

বনহুর পুনরায় দাঁতে দাঁত পিষে বললো—কোনোরকম মিথ্যা কথা চলবে না।

আমি চোরাচালানি করি কে বললো?

পুলিশের চোখে ধূলো দিলেও আমার চোখে ফাঁকি দিতে পারবে না। সিমেন্টে ভেজাল বন্ধ করেছো, এবার বন্ধ করবে তোমার ব্লাক মার্কেট বিজনেস্। বলো রাজী?

অভয়কর বিশ্বাস তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে। এ মুখ কোথাও দেখেছে বলে মনে হলো না।

একজোড়া গোঁফের নীচে কালো দু'খানা ঠোঁট। ঠিক্ যেন সিগারেটের ধোঁয়ার ধোঁয়ায় কাল্‌চে হয়ে উঠেছে। গায়ের রংটাও বনহুর পাল্টে নিয়েছিলো, ঠিক্ যতীনের মত করে।

অভয়কর বিশ্বাস অনেক চেষ্টা করেও স্মরণ করতে পারলেন না—একে পূর্বে কোথাও দেখেছেন কিনা। ঢোক গিলে বললেন—তুমিই কি সে কালোমূর্তি?

না! আমি তার বিশ্বস্ত অনুচর। কিন্তু আমার মালিক অতি ভয়ঙ্কর, যেমন দুর্দান্ত তেমনি নররক্তপিপাসু।

কে—কে তোমার সে মালিক?

একটু পূর্বেই বলেছি—কালোমূর্তি। বলো আমার আদেশ পালন করবে তো?

অধরদংশন করলেন অভয়কর, তারপর বললেন—হ্যাঁ।

কিন্তু মনে রেখো, যদি কোনরকম শয়তানি করো তাহলে তোমার মৃত্যুকে কেউ রোধ করতে পারবে না।

বনহুর কথা শেষ করে ড্রাইভিং আসন ত্যাগ করে নেমে গেলো।

অভয়কর বিশ্বাস ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন, কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হয়ে গেছে তার।

❑

স্বপ্নরাগ রিক্রিয়েশন ক্লাবের দ্বিতল একটি কামরায় থাকেন বিখ্যাত পিয়ানোবাদক মাসুদ ইরানী। একমাত্র সন্ধ্যায় তার সঙ্গে দেখা করার টাইম। সন্ধ্যা সাতটা থেকে নয়টার মধ্যে ছাড়া তাকে পাওয়া যাবে না। কারণ, মাসুদ ইরানী সর্বক্ষণ বাইরে ব্যস্ত থাকেন। নানা জায়গায় ফাংশানে-পার্টিতে তাকে যোগ দিতে হয়। যে কোনো ফাংশানে হাজার টাকা তার ফি। কাজেই মাসুদ ইরানীকে সব সময় পাওয়া যায় না।

আজ আরতী দেবী স্বয়ং এসেছে মাসুদ ইরানীর সঙ্গে দেখা করতে। মাসুদ ইরানীর সহকারী ফরিদ ওসমানী আরতী দেবীকে সসম্মানে ক্যাবিনে নিয়ে বসালেন। এখনও মাসুদ ইরানী তার বৈকালিক ভ্রমণ থেকে ফিরে আসেননি।

আরতি মনে একটা বিপুল উন্মাদনা নিয়ে বসে থাকে। মাসুদ ইরানীকে সে অভিনন্দন জানাতে এসেছে। মাসুদ ইরানীর পিয়ানোই শুধু তাকে বিমুগ্ধ করেনি, তার সৌন্দর্য আকৃষ্ট করেছে তাকে। সেদিনের পর থেকে তাপসীর মত মেয়ে আরতীর মনেও অগুন ধরে গিয়েছিলো। সব সময় হৃদয়ের কোণে একটি সুর যেন বেজে চলেছিলো—সে ঐ মাসুদ ইরানীর পিয়ানোর সুর।

আরতী আজ স্ব-ইচ্ছায় এসেছে মাসুদ ইরানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। অন্তরের অনুভুতি দিয়ে অভিনন্দন জানাতে। পিতার কুৎসিত মনোবৃত্তির কাছে সে ছিলো এক অসামান্য মেয়ে। মন তার ছিলো উদার-মহৎ বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন। অন্যায়, অনাচারকে আরতী মন থেকে ঘৃণা করতো। পিতার আচরণের প্রতি আরতীর অশ্রদ্ধা জন্মায়, পুরুষ জাতির প্রতিই সে সম্পূর্ণ বিরূপ হয়ে পড়েছিলো। সে ভাবতো, পুরুষ জাতটাই বুঝি এমনি স্বার্থপর তার মনুষ্যত্বহীন। কিন্তু মাসুদ ইরানীকে দেখা অবধি তার মনে দারুণভাবে একটা পরিবর্তন এসেছিলো—মাসুদ ইরানীর দুটি চোখে সে দেখতে পেয়েছিলো উজ্জ্বল পৌরুষ আর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ।

আরতী যখন মাসুদ ইরানী সম্বন্ধে ভাবছে তখন আচমকা কক্ষে প্রবেশ করলো সে সৌম্যসুন্দর দীপ্তকায় যুবকটি। মাথায় একরাশ সোনালী কোঁকড়ানো চুল। গভীর নীল দুটি চোখ, হাস্যউজ্জ্বল মুখমণ্ডল। আরতীকে দেখে থমকে দাঁড়ালো।

ফরিদ ওসমানী তখন কক্ষে ছিলো না।

আরতী প্রথমে বিব্রত বোধ করলো, পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললো—আমি আপনার পিয়ানোর সুরে মুগ্ধ হয়েছি।

মাসুদ ইরানী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালো, এ মেয়েটিকে সে অভয়কর বিশ্বাসের বাড়িতে দেখেছিলো। আরতীর কথায় বললো—সেজন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মাসুদ ইরানী কক্ষে প্রবেশ করতেই আরতী আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়েছিলো, মাসুদ ইরানী বললো—বসুন। নিজেও আসন গ্রহণ করলো সে।

আরতী আসনে উপবেশন করলো, চোখ দুটো তখনও স্থির হয়ে আছে মাসুদ ইরানীর মুখে। দৃষ্টি যেন ফিরিয়ে নিতে পারছে না সে।

মাসুদ ইরানী বললো এবার—আপনি অভয়কর বিশ্বাসের আত্মীয়া?

আমি তাঁর কন্যা আরতী।

মাসুদ ইরানীর মুখমণ্ডল গম্ভীর হলো।

আরতী বললো—কিছু যদি মনে না করেন আমি পিয়ানো শুনতে চাই!

এতোদূর এসেছেন কষ্ট করে, নিশ্চয়ই শোনাবো।

মাসুদ ইরানী উঠে গিয়ে তার পিয়ানোর পাশে বসলো। অপূর্ব ঝঙ্কারে মুখরিত হয়ে উঠলো কক্ষাভ্যন্তর।

মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে আছে আরতী।

মাসুদ ইরানী তার পিয়ানোর বুকে দ্রুত হস্ত চালনা করে চলেছে।

কক্ষমধ্যে উজ্জ্বল নীলাভ আলো জ্বলছিলো। সে নীলাভ আলোতে অদ্ভুত এক মোহময় পরিবেশ রচনা হচ্ছিলো। তন্ময় হয়ে গেছে আরতী মাসুদ ইরানীর পিয়ানোর সুরে।

মাসুদ ইরানীর পিয়ানো বন্ধ হয় এক সময়।

সম্বিৎ ফিরে পায় আরতী।

ভ্যানিটী ব্যাগ খুলে বের করে এক হাজার টাকার একটি বাণ্ডিল। উঠে গিয়ে মাসুদ ইরানীর সম্মুখে বাড়িয়ে ধরে আরতী —নিন, আপনার পারিশ্রমিক।

হঠাৎ মাসুদ ইরানী হেসে উঠে অদ্ভুতভাবে।

আশ্চর্য হয়ে তাকায় আরতী।

মাসুদ ইরানীর হাসি যেন থামতে চায় না।

হাঃ হাঃ হাঃ—হাঃ হাঃ হাঃ---আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায় মাসুদ ইরানী, তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলে —ধন-কুবের কন্যা—তাই অর্থের বাহাদুরী

এতো! মাসুদ ইরানী তার পিয়ানোর সুরের জন্য বাড়ি বসে কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করে না। আপনি এবার যেতে পারেন।

আরতী মাসুদ ইরানীর কথায় খুশী হতে পারে না। নত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

মাসুদ ইরানী তার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

আরতী একবার মাসুদ ইরানীর মুখে তাকিয়ে দৃষ্টি নত করে নিলো, তারপর দ্রুত বেরিয়ে গেলো কক্ষ থেকে।

মাসুদ ইরানী আবার উঠে গিয়ে পিয়ানোর সম্মুখে বসলো, চললো তার পিয়ানো সাধনা।

আপন মনে পিয়ানো বাজিয়ে চলেছে মাসুদ ইরানী। অদ্ভুত এক সুরের সৃষ্টি করে চলেছে সে। রাত গভীর হতে গভীরতর হয়ে উঠছে, কোনো দিকে খেয়াল নেই তার। দু'চোখ তার মুদিত।

স্বপ্নরাগের তিন তলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসেন এক বৃদ্ধ, মাসুদ ইরানীর কক্ষে প্রবেশ করে স্থির হয়ে দাঁড়ান তিনি। অপূর্ব জ্যোতির্ময় এক তাপস।

মাসুদ ইরানীর পিয়ানো সমানে বেজে চলেছে। কোনো দিকে খেয়াল নেই মাসুদ ইরানীর। আপনাতে সে আপনি বিভোর!

বৃদ্ধ জ্যোতির্ময় তাপস তন্ময় হয়ে মাসুদ ইরানীর সুর শুনে চলেন।

এক সময় মাসুদ ইরানীর পিয়ানো থেমে যায়। নিদ্রায় দু'চোখ ঢুলু ঢুলু হয় তার। পিয়ানোর উপর মাথা রাখে সে।

বৃদ্ধ তাপস এগিয়ে আসেন, হাত রাখেন মাসুদ ইরানীর মাথায়।

চমকে সোজা হয়ে তাকায় মাসুদ ইরানী. অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠে সে—গুরুদেব!

বৃদ্ধের দু'চোখে তীব্র অন্তর্ভেদী চাহনি স্থির কণ্ঠে বলেন তিনি—শুভাংশু--শুভাংকর--শুভায়েনমঃ---বৎসে, তোমার সাধনা সার্থক হয়েছে।

মাসুদ ইরানীর দু'চোখে উজ্জ্বল দীপ্তময় এক অপূর্ব লহরী।

বৃদ্ধের পায়ে হাত রেখে কদমবুসি করে মাসুদ ইরানী।

বৃদ্ধ ফিরে যায় আপন কক্ষে।

❑

গাড়ি থেকে বনহুর নেমে আসতেই শ্যালন ছুটে আসে, হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে বলে—এমনি করে রাতের পর রাত তুমি কোথায় কাটাও আলম?

শ্যালন, বাংলাদেশের মাটি আমাকে সব সময় আকর্ষণ করে তাই আমি কোথাও স্থির হতে পারি না। ছুটে ফিরি সদা এখান থেকে সেখানে, এ-কাজ থেকে সে-কাজে।

আমাকে তুমি সঙ্গে নিয়ে যাওনা কেন?

তুমি নারী, সব সময় টিকে উঠতে পারবে না তাই।
কিন্তু একথা ভুলে গেছো—আমি একদিন না থাকলে---
হাঁ, সেদিন আমার মৃত্যু ঘটতো তাতো কোনো সন্দেহ নেই।
আলম!
চলো শ্যালন, ঘরে যাই।
কক্ষে প্রবেশ করে জামা কাপড় খুলতে খুলতে বলে বনহুর—শ্যালন, তুমি না মাসুদ ইরানীর পিয়ানো শুনতে ভালবাস?
হাঁ, আমার বড় ভাল লাগে মাসুদ ইরানীর পিয়ানো।
আর তাকে?
এ প্রশ্ন তুমি আরও অনেক দিন করেছো। কিন্তু কেন বলো তো?
শ্যালন, মাসুদ ইরানীকে তুমি ভালবাসো—এ কথাও অস্বীকার করতে পারো না।
কিন্তু তোমার মত নয়।
মাসুদ ইরানীর চেয়ে আমাকে তুমি বেশি ভালবাসো?
হঁ। আলম, তুমি আমাকে কত বার মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছো!
সে কারণেই বুঝি আমার প্রতি তোমার এতো প্রীতি?
না, শুধু সে কারণে নয়—তোমাকে আমার ভাল লাগে।
যাক্ সে সব কথা শোনো শ্যালন, তোমাকে বলতে এতোক্ষণ ভুলেই গেছি। আজ মাসুদ ইরানী আসবেন আমাদের বাসায়।
শ্যালন যেন আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠে, বলে—সত্যি বলছো?
হাঁ, আমি তাকে আসার জন্য অনুরোধ করে এসেছি।
কিন্তু---
আবার কিন্তু কি শ্যালন?
শুনেছি তার ফি নাকি এক হাজার টাকা।
হাঁ, কিন্তু এতো টাকা আমি দেবো কোথা হতে। সত্যি আমি সে কথাও ভুলেই গিয়েছিলাম। কথাগুলো বনহুর চিন্তিত কণ্ঠে উচ্চারণ করলো।
শ্যালনের মুখ বিমর্ষ হলো।
বনহুর বললো—তা হলে মাসুদ ইরানীকে নিষেধ করে দিয়ে আসি।
না, তা হয় না।
এতো টাকা আমার নেই যে শ্যালন!
আমার এ হারের দাম এক হাজার টাকা মূল্যের বেশি হবে। আলম, তুমি এ হার বিক্রয় করে টাকা নিয়ে এসো। শ্যালন তার নিজের কণ্ঠ থেকে হার খুলে বনহুরের দিকে বাড়িয়ে ধরলো।
বনহুর হার গ্রহণে কোনো রকম আগ্রহ না দেখিয়ে হেসে বললো—অর্থের চেয়ে হারখানা যদি তুমি তাকে উপহার দাও, সেটাই হবে তার পক্ষে বেশি আনন্দের।
শ্যালনা বনহুরের কথায় সন্তুষ্ট হলো।

❑

সমস্ত দিন ধরে শ্যালন চাকর-বাকর আর নিজে খেটে-খুটে সুন্দর করে ঘরগুলো গুছিয়ে নিলো। ড্রইংরুমখানা রুচিশীল করে সাজালো শ্যালন নিজের হাতে।

বনহুর এক সময় হেসে বললো—শ্যালন, জরুরী কাজে আমাকে বাইরে যেতে হবে। মাসুদ ইরানী এলে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বসাবে। আমার ফিরতে হয়তো একটু রাত হবে।

আকাশ থেকে যেন পড়লো শ্যালন, ফুলদানীতে ফুলগুলো গুছিয়ে রাখছিলো, ফুলগুচ্ছ হস্তে ফিরে দাঁড়ালো—তা হলে সব মাটি করে দেবে আমার?

তার মানে?

মানে, তুমি চলে যাবে আর আমি একা মাসুদ ইরানীর পিয়ানো শুনবো?

তাকে কি? মাসুদ ইরানী তো তোমাকেই তার পিয়ানো শোনাতে আসবেন, আমাকে তো নয়!

তা হয় না। তুমি চলে যাবে আর আমি একা একা---

বেশিক্ষণ দেরি হবে না আমার, ঠিক ঘন্টা দুই পরে চলে আসবো।

অভিমান ভরা কণ্ঠে বলে শ্যালন—বেশ, যা ভাল মনে করো তাই হবে।

সন্ধ্যার পূর্বেই বনহুর বেরিয়ে গেলো তার ষ্টুডি কমাণ্ডার গাড়ি নিয়ে।

শ্যালন মন খারাপ করে বসে রইলো। মাসুদ ইরানী আসবে আজ তাদের বাসায়—এ কম কথা নয়। বিশ্ববিখ্যাত পিয়ানোবাদক তিনি। কত তাদের ভাগ্য, তিনি তো আর যেখানে সেখানে যান না!

শ্যালন রাগ করে কি করবে তাকেই সব দিক সামলাতে হবে যে। মাসুদ ইরানী এসে পড়বে যে এখন।

সত্যি-ই যা ভেবেছিলো, সন্ধ্যার ঘন্টাখানেক পর মাসুদ ইরানী তার বিরাট প্লিমাউথ গাড়ি নিয়ে পৌছে গেলো হাওড়া শালকিয়া গঙ্গাতীরস্থ শ্যালনের বাসভবনে।

শ্যালন প্রথমে একটু হক্‌চকিয়ে গেলেও সামলে নিলো সে অল্পক্ষণে। নিজে গিয়ে মাসুদ ইরানীকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে এলো অভ্যন্তরে।

মাসুদ ইরানী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে বললেন—আপনার স্বামীকে দেখছি না যে?

শ্যালন আম্‌তা আম্‌তা করে জবাব দিলো—তিনি অল্পক্ষণের জন্য বাইরে গেছেন।

শ্যালন নিজ হস্তে মাসুদ ইরানীর খাবারের আয়োজন করলো।

কিন্তু মাসুদ ইরানী আগে খেলেন না, তিনি বললেন—আলম সাহেব এলে এক সঙ্গে খাবেন। পিয়ানোর পাশে গিয়ে বসলেন মাসুদ ইরানী।

শ্যালন তার অদূরে একটি সোফায় বসেছিলো।

মাসুদ ইরানী ডাকলেন—এখানে আমার সম্মুখে বসুন।

শ্যালন দ্বিধাজড়িতভাবে উঠে এসে বসলো মাসুদ ইরানীর সম্মুখস্থ আসনে। হেসে বললো—আপনি বহু শ্রোতামহলে পিয়ানো শুনিয়ে তাদের আনন্দ দান করেন। আজ কিন্তু আমি একা আপনার পিয়ানো শ্রোতা।

সেই ভাল। বহু শ্রোতা এবং দর্শক মহলের শুনাম কুড়োনোর চেয়ে একজনের প্রশংসা অত্যন্ত কামনার, যদি সে তেমনি কোনো একজন ব্যক্তি হয়।

শ্যালন হাসলো—আমি তো তেমন কোনো ব্যক্তি নই।

তবু আপনি একাই যথেষ্ট। কথাটা বলে মাসুদ ইরানী পিয়ানোতে হাত রাখেন।

মধুময় ঝঙ্কারে মুখর হয়ে উঠে গঙ্গাতীরস্থ বাংলো বাড়িটা। রাতের অন্ধকারে গঙ্গার বুকে জাগে এক অপূর্ব সুরের লহরী।

মাসুদ ইরানী পিয়ানো বাজিয়ে চলে।

ভুলে যায় শ্যালন তার আপন সত্তা। আলমের কথা তার মন থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্য।

মাসুদ ইরানীর পিয়ানো বেজেই চলে।

রাত বেড়ে আসে।

মাসুদ ইরানী পিয়ানো রেখে উঠে দাঁড়ায়।

শ্যালন তখনও তন্দ্রাচ্ছন্নের মত বসেই আছে।

মাসুদ ইরানী এবার বিদায় চায়।

শ্যালন ফিরে পায় তার সম্বিৎ, বলে—এতো শীঘ্র চলে যাবেন? আর একটু বাজাবেন না?

আজ নয়, আবার আসবো।

শ্যালন কণ্ঠ থেকে হার ছড়া খুলে বাড়িয়ে ধরে—টাকা নেই, তাই---

হাসে মাসুদ ইরানী—ওটা আপনার গলাতেই থাক। টাকার চেয়ে আপনার সান্নিধ্য আমার কাছে অনেক মূল্যবান।

মাসুদ ইরানীর কথায় শ্যালন যেন অভিভূত হয়ে পড়ে। এমনি করে আলম তো কোনোদিন তাকে বলে না। তার আলমের চেয়ে মাসুদ ইরানীর হৃদয় কত স্বচ্ছ!

মাসুদ ইরানী বিদায় নিয়ে চলে যায়।

শ্যালন পিয়ানোর পাশে গিয়ে বসে, হাত বুলায় সে পিয়ানোখানার উপর।

পিছনে এসে কখন যে দাঁড়িয়ে আছে বনহুর সে দেখতে পায়নি। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে দেখে সে, মুখে ফুটে উঠে একটা আনন্দদ্যুতি। ডাকে এক সময় —শ্যালন!

চমকে ফিরে তাকায় শ্যালন, তাড়াতাড়ি পিয়ানোর পাশ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলে—এতো দেরী করে এলে আলম? বাহু দুটি দিয়ে জড়িয়ে ধরে ওর কণ্ঠ।

হাসিমুখে জবাব দেয় বনহুর—কাজে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম, তাই ফিরতে দেরী হয়ে গেলো। সত্যি আমি বড্ড অপেয়, তাই তোমার মাসুদ ইরানীর পিয়ানো আজ শুনবার সৌভাগ্য আমার হলোনা।

কিন্তু মাসুদ ইরানী বার বার তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন।

নিশ্চয়ই তোমার ব্যবহারে সে মুগ্ধ হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আলম, সে বলেছে আবার আসবে।

সত্যি বলছো?

হাঁ। আর শোনো, মাসুদ ইরানী কোনো রকম ফি নেননি আমার কাছে। হার দিতে গিয়েছিলাম—নিলেন না।

চমৎকার! চমৎকার তো? তাহলে মাসুদ ইরানী তোমাকে বাড়ি বয়ে আপনা-আপনি পিয়ানো শুনিয়ে গিয়েছেন? হুঁ, হবেই তো! এবার থেকে শুধু আর একদিন কেন, রোজই ধন্না দেবেন--- একটু চুপ থেকে বললো বনহুর—মাসুদ ইরানীর পিয়ানোর সুর তোমাকে যেমন মুগ্ধ করেছে শ্যালন, তেমনি মুগ্ধ হয়েছে মাসুদ ইরানী তোমার রূপে।

শ্যালন বনহুরের কথাটা শুনে হেসে উঠলো খিল খিল করে, তারপর বললো—এ কথা তোমাকে কে বলেছে?

আমার মন।

উঁ হুঁ, তুমি ঠিক বানিয়ে বলছো।

মোটেই না।

❑

মিথ্যা নয়, এর পর থেকে মাঝে মাঝে প্রায়ই মাসুদ ইরানী তার প্লিমাউথ গাড়িখানা নিয়ে হাজির হতো শ্যালনের পাশে। পিয়ানো বাজাতো, শ্যালন মুগ্ধ হয়ে শুনতো। কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করতো না মাসুদ ইরানী শ্যালনের কাছে।

কিন্তু কোনোদিন বনহুর থাকাকালীন মাসুদ ইরানী আসতো না। শ্যালন এ জন্য অনেক সময় দুঃখ করতো।

শ্যালনের এ অনুতাপ শুনে হাসতো বনহুর।

শ্যালন বলতো—হাসলে যে বড়?

বনহুর বলতো—মাসুদ ইরানী আসেন তোমার জন্য—আমার জন্য নয়। নইলে হাজার টাকা যার এক ঘন্টা ফি, তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তোমাকে পিয়ানো শোনান। শ্যালন, একটা কথা সত্যি করে বলবে?

বলবো, বলো কি কথা?

মাসুদ ইরানীকে তুমি ভালবাসো?

এই কথা?

হাঁ, শ্যালন আমার বড় শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে।

শ্যালনের মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে, কোনো জবাব দেয় না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে বনহুর—তোমার মন থেকে আমি অনেক দূরে সরে পড়েছি, তাই না?

উঁ হুঁ, মাসুদ ইরানীর চেয়ে তোমাকে অনেক—অনেক ভালবাসি---শ্যালন বনহুরের গলা জড়িয়ে ধরে —কত সুন্দর তুমি!

তোমার মাসুদ ইরানীর মত নয়।

তার চেয়েও সুন্দর আলম!

❑

পড়ার ঘরে বসে আর্থার একটা বই পড়ছিলো।

রাত অনেক হয়ে এসেছে, মাঝে মাঝে হাই তুলছিলো সে। যদিও তার চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে তবু বেশ ভালো লাগছিলো বইখানা।

হঠাৎ পিছনে এসে কে যেন দাঁড়ালো, কাঁধে হাত রাখলো আর্থারের।

চমকে ফিরে তাকালো আর্থার, অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলো— মিঃ আলম! বহুদিন অদর্শনের পর হঠাৎ আজ গভীর রাতে তার কক্ষে আলমকে দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলো।

বনহুর তার সম্মুখস্থ আসনে উপবেশন করে বললো—আজ অর্থ নিতে আসিনি।

কি চান তাহলে?

আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।

কি কাজ?

তার পূর্বে বলেন, শ্যালনকে আপনি ভালবাসতেন কিনা?

আশ্চর্য হয়ে তাকায় আর্থার বনহুরের মুখে। এতো রাতে সে বহুদিন পর আলমকে তার কক্ষে দেখে অবাক হয়ে গেছে। তারপর আচম্‌কা এক অদ্ভুত প্রশ্ন, তবু যদি শ্যালন থাকতো! কিন্তু সে তো আর নেই, কোথায় চলে গেছে কে জানে!

বিশেষ করে আর্থার জানতো না শ্যালনকে তার পিতা স্বয়ং তুলে দিয়ে এসেছিলেন নরাধম শয়তান অভয়কর বিশ্বাসের হাতে। সে জানতো শ্যালন তাদের বাড়িতে কাউকে না বলে কোথায় চলে গেছে। শ্যালনকে সে ভালবাসতো এ সুনিশ্চয়, কিন্তু শ্যালনের কাছে সে এতোটুকু সহানুভূতি বা আশ্বাস পায়নি কোনোদিন। তবু ঢোক গিলে বললো—হাঁ বাসতাম। কিন্তু শ্যালন তো আমাদের বাড়ি থেকে চলে গেছে। কোথায় চলে গেছে তাও জানিনে।

বললো বনহুর—শ্যালন আমার কাছেই আছে।

আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো আর্থারের মুখমণ্ডল।

খুশী হলো বনহুর। এমনি আশাই করেছিলো সে, আর্থার শ্যালনের উপযুক্ত, তাতে কোনো ভুল নেই। অর্থবান সুন্দর সুপুরুষ, যে কোনো নারীর পক্ষে আর্থার কামনার পাত্র।

বনহুর বললো—শ্যালনকে আপনি বিয়ে করতে রাজি আছেন?
শ্যালন কি আমাকে বিয়ে করতে রাজি হবে?
আপনার মত থাকলে আমি তাকে বাগিয়ে নেবো।
জোর করে ভালবাসা আদায় করা যায় না মিঃ আলম।
তাই বলে শ্যালনের মত একটি মেয়েকে হেলায় দূরে সরিয়ে দেওয়াও যায় না আর্থার। আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।
কোথায়?
স্বপ্নরাগ রিক্রিয়েশন ক্লাবে। সেখানে মাসুদ ইরানীর কাছে পিয়ানো শিখতে হবে।
পিয়ানো।
হাঁ, কারণ শ্যালন পিয়ানো ভালবাসে।
কিন্তু!
কোনো কিন্তু নয়—মাসুদ ইরানীর কাছে আপনি পিয়ানো বাজানো শিখবেন।
আমি তো পিয়ানো বাজাতে জানিনে।
জানেন না তাইতো শিখতে হবে। চলুন--
আর্থার হাতের বইখানা রেখে মোহগ্রস্তের মত উঠে দাঁড়ালো। কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো বনহুরের পিছনে পিছনে।
গাড়ির পিছন আসনে আর্থারকে বসিয়ে নিজে বসলো বনহুর ড্রাইভিং আসনে। পিছন ফিরে বললো-কোনো ভয় নেই, নিশ্চিন্ত থাকুন।

❑

স্বপ্নরাগ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সম্মুখে এসে গাড়ি রেখে নেমে পড়লো বনহুর, পিছন আসনের দরজা খুলে ধরে বললো—নেমে আসুন।
সুবোধ বালকের মত নেমে পড়লো আর্থার।
মাসুদ ইরানীর কক্ষে গিয়ে দাঁড়ালো বনহুর আর আর্থার।
বনহুর বললো-আপনি বসুন, আমি মাসুদ ইরানীকে ডেকে আনছি।
এতো রাতে তিনি জেগে আছেন?
হাতঘড়ির দিকে তাকায় বনহুর—এখন তো সবে একটা—দশ। রাত তিনটে অবধি মাসুদ ইরানী তাঁর কক্ষে জেগে থাকেন। আপনি বসুন।
বনহুর পাশের কামরায় চলে যায়।
আর্থার বসে পড়ে একটা সোফায়।
প্রায় মিনিট কয়েক পরে মাসুদ ইরানী মন্থর গতিতে প্রবেশ করে সে কক্ষে।
আর্থার উঠে দাঁড়ায়, অভিনন্দন জানায়।
মাসুদ ইরানী গম্ভীর স্থির কণ্ঠে বলে—মিঃ আলমের কাছে সব অবগত হয়েছি মিঃ আর্থার। আপনি পিয়ানোবাদক হতে চান?

হ্যাঁ, কিন্তু পারবো কিনা জানিনে।

কেন পারবেন না! পৃথিবীতে এমন কোনো কাজ নেই যা মানুষ পারে না। চেষ্টাই মানুষের জীবনে সফলতা আনে।

আসুন।

আর্থার মাসুদ ইরানীর সঙ্গে এগুলো।

পিয়ানোর পাশে গিয়ে বসলো মাসুদ ইরানী, বসতে বললো আর্থারকে তার পাশে। মাসুদ ইরানী তাকালো দরজার দিকে, হয়তো মিঃ আলমের সন্ধানে দৃষ্টি তার ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

মাসুদ ইরানী বললো—মিঃ আলম বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তাই তিনি বিশ্রাম করছেন।

তারপর চলে আর্থারকে মাসুদ ইরানীর পিয়ানো শেখানোর পালা। সম্পূর্ণ নতুন এ ব্যাপারে আর্থার, কিন্তু মনে তার বিপুল শেখার বাসনা। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে চলে, মাসুদ ইরানী সমস্ত অন্তর দিয়ে আর্থারকে শিক্ষা দান করে চলে।

এক সময় ভোর হয়ে আসে, মাসুদ ইরানী ছেড়ে দেয় আর্থারকে। বলে সে—এবার যেতে পারেন, কিন্তু আবার আসবেন রাত দশটায়।

তন্দ্রাচ্ছন্নের মত জবাব দেয় আর্থার—নিশ্চয়ই আসবো।

আর্থার গাড়িতে গিয়ে বসে, মনের মধ্যে তখন নানা রকম চিন্তার ফুলঝুরি ঝরে পড়তে থাকে। পিয়ানো বাজানো তাকে শিখতেই হবে, তাহলে পাবে সে শ্যালনকে। শ্যালনের রূপরাশি তাকে নতুনভাবে আকৃষ্ট করে চললো। যদিও এখন তার সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা নেই, তবু আশার একটা ক্ষীণ আলো উঁকি দেয় তার মনের কোণে।

সে দিনের পর হতে রোজই আসতে শুরু করলো আর্থার স্বপ্নরাগ রিক্রিয়েশন ক্লাবের দ্বিতলে মাসুদ ইরানীর কক্ষে। রাতের পর রাত চলতে লাগলো আর্থারের পিয়ানো সাধনা।

❑

মাসুদ ইরানী পিয়ানো বাজাচ্ছিলো।

পাশে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে আছে শ্যালন।

পিয়ানো বাজানো শেষ করে ফিরে তাকায় মাসুদ ইরানী শ্যালনের মুখে। অদ্ভুত কালো ড্রেসে আজ অপূর্ব সুন্দর মানিয়েছে মাসুদ ইরানীকে। মাথার সোনালী কোঁকড়ানো চুলগুলো ছড়িয়ে আছে ললাটের চারপাশে। হাস্যোউজ্জ্বল মুখমণ্ডল। মাসুদ ইরানী শ্যালনের মুখে চাইতেই উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হয়। বলে মাসুদ ইরানী— চলুন না আজ শহর থেকে দূরে কোথাও যাই?

কিন্তু আলম যে এখনও ফিরে আসেনি?

তাতে কি আছে, আমার সঙ্গে গেলে নিশ্চয়ই মিঃ আলম কিছু বলবেন না বা মনে করবেন না, জানি তিনি একজন মহৎ ব্যক্তি।

হাঁ, আলম সত্যিই মহান হৃদয় লোক।

চলুন শহর থেকে আজ আমরা চলে যাবো অনেক দূরে বাইরে কোথাও। শহরের কর্মব্যস্ততার কোলাহল যেখানে নেই।

নেই যন্ত্রচালিত যানবাহনের কর্কশ নিষ্ঠুর শব্দ। নেই কলকারখানার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসার মত জমাট ধূম্ররাশি। মিস শ্যালন, আমি শহরের একঘেয়েমিতে বড় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি।

উঠে দাঁড়ায় শ্যালন—একটু অপেক্ষা করুন, আমি তৈরি হয়ে ফিরে আসছি।

শ্যালন চলে যায়, কিছুক্ষণ পর ফিরে আসে।

মাসুদ ইরানী অবাক হয়ে তাকায় শ্যালনের পা-থেকে মাথা পর্যন্ত। হেসে বলে—চমৎকার!

শ্যালনও ঠিক্ মাসুদ ইরানীর মত কালো গাউন পরে সজ্জিত হয়ে নিয়েছে। শ্যালনের সোনালী চুলগুলোও এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে ঘাড়ে -পিঠে-কাঁধের চারপাশে।

আজ মাসুদ ইরানী শ্যালনের হাত মুঠায় চেপে ধরে বলে—মিস শ্যালন, সত্যি আপনি অপূর্ব!

আপনিও! ছোট্ট করে জবাব দেয় শ্যালন।

❑

কলকাতা শহরের বাইরে এসে পড়ে তারা।

আজ নতুন নয় শ্যালনের, আরও কয়েকদিন সে মাসুদ ইরানীর সঙ্গে বেড়াতে বের হয়েছে কিন্তু শহরের বাইরে এতদূরে কোনোদিন আসেনি। আলিপুরের বাগান, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল—আর কোনোদিন বা গিয়েছে চিত্রা সিনেমা হলে বা ষ্টার থিয়েটারে। আলম এজন্য কোনোদিন তাকে কিছু বলেনি বরং শুনে খুশীই হয়েছে। তাই শ্যালন আজও মাসুদ ইরানীর সঙ্গে এক কথায় বেরিয়ে পড়লো নিঃসঙ্কোচে। একেবারে পল্লীর জনহীন পথে এক্কা ঘোড়ার গাড়িতে পাশা-পাশি বসেছে ওরা। মাসুদ ইরানী ঘোড়ার লাগাম হাতের মুঠায় চেপে ধরে বসেছিলো। হাস্যোদ্দীপ্ত ওর মুখ, শ্যালনকে সম্মুখে বসিয়ে অনুভব করছিলো প্রকৃতির অপূর্ব দৃশ্য।

মেঘশুন্য আকাশ।

বৈকালের শেষ সূর্যাস্তের আলোকরশ্মি ছড়িয়ে পড়ছিলো তাদের চোখেমুখে। এলোমেলো বাতাসে দেহমন যেন আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠছিলো।

ঘোড়ার গাড়ির ঘড় ঘড় আওয়াজের সঙ্গে, ঘোড়ার খুরের খট খট শব্দ এক যাদুময় পরিবেশ সৃষ্টি করছিলো।

মাসুদ ইরানী বললো—মিস শ্যালন, আপনি গান গাইতে জানেন?

জানি, কিন্তু ভাল লাগবে আপনার?

কেন লাগবে না?

আপনি হলেন একজন পৃথিবীর সেরা সঙ্গীত-সাধক আর আমি কোন্ ছার —সামান্য একটি তরুণী।

হাসে মাসুদ ইরানী— সঙ্গীত-সাধক হলেও গায়ক তো নই।

এমুহূর্তে তোমার মিষ্টি গলার সুমিষ্ট আওয়াজ নির্জন প্রন্তরে এক অভিনব সুর সৃষ্টি করবে।

বেশ গাইছি...শ্যালন গান গায়।

এক্কা ঘোড়ার গাড়ির খট খট আওয়াজ আর শ্যালনেরর গানের সুর অদ্ভুত এক পরিবেশের সৃষ্টি করে চলে।

তারপর এক সময় ফিরে আসে মাসুদ ইরানী আর শ্যালন। দিনের পর দিন মাসুদ ইরানী আর শ্যালনের মধ্যে এমনি করে গড়ে উঠে গভীর এক প্রেমের সৌধ। আলম ধীরে ধীরে সরে পড়তে থাকে শ্যালনের মনের গহন থেকে।

এদিকে যেমন মাসুদ ইরানী আর শ্যালনের মধ্যে একটা গভীর সম্বন্ধ গড়ে উঠছিলো, ওদিকে তখন আর্থার পিয়ানো সাধনা নিয়ে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটিয়ে চলেছে।

আর্থার পিয়ানো বাজায়— মাসুদ ইরানী পায়চারী করে আর কি যেন গভীরভাবে চিন্তা করে। হঠাৎ একদিন আর্থারের পিয়ানো তাকে আত্মহারা করে ফেললো, মাসুদ ইরানী আনন্দের আতিশয্যে জড়িয়ে ধরলো আর্থারকে, অস্ফুট কণ্ঠে বললো— আপনি সার্থক হয়েছেন মিঃ আর্থার, আপনি জয়ী হবেন!

মাসুদ ইরানী আচম্‌কা খুলে ফেলে তার মাথার কোঁকড়ানো রেশমী সোনালী চুলগুলো।

অবাক চোখে তাকায় আর্থার, বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে উঠে— মিঃ আলম!

হাঁ, মাসুদ, ইরানীর কাজ আজ থেকে শেষ হলো।

কিন্তু আপনি---------

এবার আপনাকে মাসুদ ইরানী সাজতে হবে।

আমাকে?

হাঁ, আজ থেকে আপনিই মাসুদ ইরানী। মিঃ আর্থার, আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ কতগুলো কথা আছে। —মাসুদ ইরানীর ড্রেস পাল্টে ফিরে এলো বনহুর। বসলো আর্থারের পাশে, সিগারেট কেসটা হাতে তুলে নিয়ে বাড়িয়ে ধরলো—মিঃ আর্থার, নিন।

আর্থার শুধু স্তম্ভিতই নয়, হতভম্ব হয়ে গেছে— সে কল্পনাও করতে পারেনি— আলম মাসুদ ইরানী। তন্দ্রাচ্ছন্নের মত বনহুরের এগিয়ে ধরা সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট তুলে নিলো।

বনহুর নিজেও একটা সিগারেট ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে দিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করলো। একমুখ ধূয়া সম্মুখে ছুঁড়ে দিয়ে বললো— মিঃ আর্থার, পিয়ানো কোনোদিনই আমার চর্চ্চা ছিলো না। কলকাতায় এসে আমি বাধ্য হয়েছি পিয়ানো চর্চ্চা করতে। কয়েক মাসের সাধনায় আমি জয়লাভ করেছি। আমার কার্যসিদ্ধি হয়েছে। শ্যালন ভালবাসতো আলমকে, এখন সে ভালবাসে পিয়ানোবাদক মাসুদ ইরানীকে। মিঃ আর্থার, এবার আপনাকে কিছুদিনের জন্য মাসুদ ইরানীর অভিনয় করতে হবে— বিশেষ করে শ্যালনের সঙ্গে।

ঢোক গিলে শুষ্ক কণ্ঠে বললো আর্থার— মাসুদ ইরানী!

হাঁ, ভয় নেই আপনাকে আমি সাহায্য করবো। চলুন পাশের ঘরে। বনহুর টেবিলে খুলে রাখা সোনালী কোঁকড়ানো পরচুলাটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো— আসুন আমার সঙ্গে।

আর্থার অনুসরণ করলো বনহুরকে।

তারপর নিজের হস্তে আর্থারকে মাসুদ ইরানীর ড্রেস পরিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো— ভেরি নাইস্---এই হলেই চলবে। কিন্তু মনে রাখুন, কোনো সময় আপনি শ্যালনের কথায় ঘাবড়ে যাবেন না বা কোন কেনোরকম দুর্বলতা প্রকাশ করবেন না।

বনহুর আরও ভাল করে বুঝিয়ে দিলো কেমন করে তার চলতে হবে। প্রথম শ্যালনের বাড়িতে গিয়ে তাকে কিভাবে অভ্যর্থনা জানাতে হবে। তারপর কিভাবে আলাপ—আলোচনা করতে হবে— সব বলে ঠিক করে নিলো বনহুর।

মাসুদ ইরানীর বেশে আর্থারকে ঠিক পূর্বের মাসুদ ইরানীর মতই লাগছে।

বনহুর তার বিরাট প্লিমাউথ্ গাড়ির ড্রাইভিং আসনে মাসুদ ইরানীবেশী আর্থারকে বসিয়ে নিজেও বসলো তার পাশে।

গাড়ি চালিয়ে চললো আর্থার মানে মাসুদ ইরানী।

❑

শ্যালন রেলিং এর পাশে ঝুকে পথের দিকে তাকিয়ে ছিলো, মাসুদ ইরানীর আসার সময় হয়েছে। প্রতিদিন সে এমনি সময় মাসুদ ইরানীর প্রতীক্ষায় রেলিং -এর পাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

গাড়ি-বারান্দায় গাড়ি পৌছতেই ছুটে এলো শ্যালন তার হাইহিল জুতোর গোড়ালীতে শব্দ তুলে। কিন্তু গাড়ির পাশে এসে থমকে দাঁড়ালো, বললো— আলম তুমি!

বনহুর হাসিমুখে বললো— হঠাৎ পথের মধ্যে মাসুদ ইরানী আমাকে দেখতে পেয়ে তার গাড়িতে উঠিয়ে নিলেন।

গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়লো বনহুর আর মাসুদ ইরানী

শ্যালন মাসুদ ইরানীর দক্ষিণ হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে চুম্বন করলো হাতের পিঠে।

তারপর তিনজন এগিয়ে গেলো হলঘরে।

বনহুর বললো— মাসুদ ইরানী, সত্যি আমি দুঃখিত— এতো দিনের মধ্যে আজ শুধু আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ ঘটলো।

হেসে বললো মাসুদ ইরানী—আমিও সেজন্য কম দুঃখিত নই মিঃ আলম। যাক্, তবু আপনার সঙ্গে পূর্বে আলাপ ছিলো বলেই আজ পথে আপনাকে দেখতে পেয়ে সঙ্গী করে নিতে পারলাম।

আমার পরম সৌভাগ্য আজ আপনার পিয়ানো শুনতে পাবো। কি বলো শ্যালন, সত্যি কিনা?

নিশ্চয়ই আজ তোমার পরম ভাগ্য আলম।

বনহুর হাসলো।

মাসুদ ইরানী পিয়ানোর পাশে গিয়ে বসলো।

শ্যালনও উঠে এসে বসলো ওর পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে।

বনহুর বললো— এবার শুরু করুন মিঃ ইরানী।

মাসুদ ইরানী একবার বনহুরের মুখে তাকিয়ে নিয়ে পিয়ানোতে হাত রাখলো। বুকের মধ্যে ওর ঢিপ্ ঢিপ্ করছে তখন।

বনহুরের মনেও যে আলোড়ন শুরু হয়নি তা নয়, যদি কোনো রকম ভুল হয় তাহলে শ্যালন নিশ্চয়ই ধরে ফেলবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাসুদ ইরানীবেশি আর্থার ঠিকভাবে পিয়ানো বাজিয়ে গেলো।

বনহুরের আনন্দ আর ধরে না!

পিয়ানো বাজানো শেষ করে মাসুদ ইরানী তাকালো বনহুরের দিকে।

বনহুর মাথা নত করে অভিনন্দন জানালো।

শ্যালনের করতালিতে মুখর হয়ে উঠলো হলঘর।

সেদিন আর বেশিক্ষণ মাসুদ ইরানী অপেক্ষা করলো না, সে শ্যালন আর আলমের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলো।

বনহুর লক্ষ্য করলো, শ্যালনের মুখ বেশ গম্ভীর হয়েছে।

তখনও তাকিয়ে আছে শ্যালন যেদিকে প্লিমাউথ গাড়িখানা অন্তর্ধান হয়েছে।

বনহুর কাঁধে হাত রাখে শ্যালনের।

শ্যালন ফিরে তাকায়, বনহুরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই মাথা নত করে নেয়।

বনহুর হেসে উঠে— আমি বুঝতে পেরেছি শ্যালন, মাসুদ ইরানী তোমার হৃদয়-মন হরণ করে নিয়েছে।

শ্যালন আবার তাকায় বনহুরের মুখে, সে দেখতে চায় ও-মুখে কোনো রকম পরিবর্তন এসেছে কিনা।

বনহুর শ্যালনের হাত ধরে কক্ষমধ্যে নিয়ে যায়, ওকে বসিয়ে দিয়ে নিজেও বসে পাশের সোফায়, বলে বনহুর— শ্যালন, মাসুদ ইরানী তোমাকে বিয়ে করতে চায়, বলো তুমি রাজী আছো?

শ্যালন ক্ষণিকের জন্য আনমনা হয়ে যায়-----একদিন আলমকে বিয়ে করার জন্য শপথ করেছিলো সে। আজ আর একজনকে বিয়ে করবে বলে কি করে মত দেবে!

শ্যালনকে নিশ্চুপ থাকতে দেখে বলে বনহুর—বিশ্ববিখ্যাত পিয়ানোবাদক মাসুদ ইরানী বহু নারীর কামনার পাত্র। শ্যালন, তাঁকে স্বামীরূপে পাওয়া পরম ভাগ্যের কথা। বলে তাকে বিয়ে করতে রাজি আছো?

শ্যালন বলে এবার— হাঁ, রাজী আছি।

তোমাকে কংগ্রাচুলেশন্ জানাচ্ছি শ্যালন। বনহুরের কণ্ঠে আনন্দ ধ্বনি হয়।

শ্যালন করুণ চোখে তাকায়, ব্যথাভরা কণ্ঠে বলে— তুমি রাগ করলে না তো?

রাগ। উহু! তোমার উপযুক্ত আমি নই শ্যালন, তাই আমি মনকে শক্ত করে নিয়েছি। একটু নিশ্চুপ রইলো বনহুর, তারপর বললো— মাসুদ ইরানী যদি কাল আসে তুমি তাকে বলো। শ্যালন, সে তোমার মুখে বিয়ের কথাটা শুনতে চায়।

সেদিন আর বেশি কথা হলো না তাদের মধ্যে।

বনহুর নিজের ঘরের দিকে চলে গেলো।

শ্যালনের চোখে আজ স্বপ্নের মায়াজাল, সে কল্পনার চোখে দেখতে পায়-- সে তার মাসুদ ইরানীর পাশে বসে আছে। মাসুদ ইরানী পিয়ানো বাজিয়ে চলেছে, তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছে শ্যালন তার মুখের দিকে। ----নির্জন পল্লীর জনহীন পথ। এক্কা ঘোড়ার গাড়ি। পাশাপাশি বসে আছে মাসুদ ইরানী আর সে। মাসুদ ইরানীর হস্তে অশ্বের লাগাম, শরীরে তার কালো ড্রেস, মুখে মিষ্টি মধুর হাসি। ------শ্যালনের শরীরেও ওর মত কালো ড্রেস, বাতাসে চুলগুলো উড়ছে। গান গাইছে শ্যালন, অপূর্ব সুরের ঝঙ্কারে মুখরিত হয়ে উঠেছে পথ আর প্রান্তর। আকাশের নীল ওদের মনে লাগিয়েছে রঙের রামধনু।-----মাসুদ ইরানী শ্যালনকে টেনে নেয়, শ্যালন ওর বুকে মাথা রাখে----- মাসুদ ইরানীর সঙ্গে শ্যালনের দিনগুলো ভেসে উঠে পর পর তার মনের আকাশে।

পাশের কক্ষে তখন বনহুর বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে তাকিয়ে আছে কড়িকাঠের দিকে। আফ্রিকার জঙ্গলে কি করে শ্যালনকে সে গরিলার কবল

থেকে উদ্ধার করেছিলো। কি করে জাহাজে একসঙ্গে কেটেছে ওদের। তারপর কলকাতায় আসার পর থেকে শ্যালন আর তার দিনগুলো কিভাবে এগুচ্ছিলো— সব স্মরণ হতে লাগলো আজ বনহুরের নতুন করে। শ্যালনকে ভাল লেগেছিলো, কেন এতো মুগ্ধ হয়েছিলো ওর প্রতি বনহুর নিজেই যেন বুঝতে পারেনি। নিজের অজ্ঞাতেই সে একদিন আকৃষ্ট হয়েছিলো শ্যালনের মধ্যে। অবশ্য শ্যালনকে সর্বক্ষণ, সর্বদিন ফাঁকি দিয়ে এসেছে। সরলপ্রাণা শ্যালন গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছিলো আলমকে, সে কোন দিন বুঝতে পারেনি— আলম তাকে সর্বসময় এড়িয়ে চলতে চায়! তবে মাসুদ ইরানীর বেশে বনহুরকে অনেকখানি ধরা দিতে হয়েছিলো শ্যালনের কাছে। তা না হলে কোনো উপায় ছিলো না।

আজ শ্যালনকে মাসুদ ইরানীবেশি আর্থারের হাতে তুলে দিতে সত্যি তার অন্তরে একটা গভীর ব্যথা অনুভব করছিলো। শ্যালনকে নিজের অজ্ঞাতে কখন যে সে এতোখানি ভালবেসেছিলো —সে-ই টের পায়নি। সমস্ত রাত বনহুর অনেক চিন্তা করলো, আবোল-তাবোল কত কি ভাবলো— আজ কেউ বাদ গেলোনা তার চিন্তাধারা থেকে। দস্যু কালু খাঁ থেকে তার মা---- বাবা, মনিরা, নূরী, একমাত্র সন্তান নূরের কথাও আজ স্মরণ হলো।

কান্দাই ফিরে যাবার জন্য মন যেন অস্থির হয়ে উঠেছে। তার আস্তানা, অনুচরবর্গ, অশ্ব তাজ এদের কথা আজ বার বার মনে পড়তে লাগলো। কতদিন হলো বনহুর তার আস্তানা ত্যাগ করে এসেছে।

প্রায় সমস্ত রাত্রিই ঘুম হলো না বনহুরের।

❑

পরদিন এলো মাসুদ ইরানী।

শ্যালন আনন্দে আপ্লুত হলো।

বনহুর তখন নিজের কক্ষে পায়চারী করছে। শ্যালনকে কত বড় ধোকা সে আজ দিতে চলেছে। শ্যালন কি সত্যিই মাসুদ ইরানীকে ভালবেসেছিলো? সে ভালোবেসেছিলো মাসুদ ইরানী আসল মানুষটিকে —তার খোলসটিকে নয়। আজ সরল প্রাণা শ্যালনের পাশে যাকে মাসুদ ইরানী বেশে উপস্থিত করে দিয়েছে বনহুর, সে মাসুদ ইরানীর খোলস ছাড়া কিছু নয়।

মনটা আজ বড় অস্থির লাগছে বনহুরের। পাশের কামরায় শ্যালনের প্রাণখোলা হাসির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। হয়তো বা মাসুদ ইরানীর সঙ্গে সে কোনো ব্যাপারে আনন্দে মেতে উঠেছে।

বনহুর মনকে স্থির করে নেয়, শ্যালনকে আর্থারের হাতে যতক্ষণ সঁপে না দিচ্ছে ততক্ষণ তার স্বস্তি নেই।

এমন সময় মাসুদ ইরানীর হাত ধরে শ্যালন তার কক্ষে প্রবেশ করে।

বনহুর পায়চারী করছিলো, থমকে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে তাকায়।

শ্যালন বলে— আমরা একটু বাইরে যাচ্ছি আলম।

বেশ যাও। বললো বনহুর।

শ্যালন আর মাসুদ ইরানীবেশি আর্থার বেরিয়ে গেলো তার কক্ষ থেকে।

শ্যালন মাসুদ ইরানীর হাত ধরে নিয়ে গেলো, প্রায় টেনে নিয়েই চললো সে ওকে।

বনহুর দ্বিতলের রেলিং-এর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। দেখতে পেলো— শ্যালন মাসুদ ইরানীর হাত ধরে গাড়িতে উঠে বসলো। উভয়ে উভয়ের মুখে তাকিয়ে হাসছে।

মাসুদ ইরানীবেশি আর্থার ঠিক বনহুরের অনুকরণেই অভিনয় করে চলছে। হাসলো বনহুর, আপন মনেই বললো সে— সার্থক আর্থার তুমি!

সেদিনই আর্থারবেশী মাসুদ ইরানী আর শ্যালন ফিরে আসার পর বনহুর ওদের মধ্যে দাঁড়ালো, হেসে বললো— আমি তোমাদের একটি কথা বলতে চাই।

শ্যালন ও আর্থার প্রশ্ন ভরা দৃষ্টি তুলে তাকালো।

বনহুর বললো— শ্যালন, আমি চাই তোমাদের এ প্রীতির বন্ধনকে দৃঢ়— আরও মজবুত করে দিতে! বলো, তোমরা রাজী আছো?

শ্যালন আর মাসুদ ইরানী মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিলো। তারপর বললো শ্যালন— হাঁ, আমরা রাজী আছি।

বনহুর এবার ওদের দু'জনাকে নিয়ে ক্যালকাটা সেন্ট জন্স গীর্জায় গিয়ে উপস্থিত হলো।

ঠিক বিয়ের পূর্ব মুহূর্তে বললো বনহুর— শ্যালন, একটি কথা আছে তোমার সঙ্গে।

শ্যালন বললো— বলো?

বনহুর ওকে গীর্জার এক পাশে নিয়ে গিয়ে বললো— শ্যালন, সত্যিই তুমি মাসুদ ইরানীকে ভালবাসো তো?

হাঁ, তাকে আমি ভালবাসি।

অন্তর থেকে বললে এ কথা?

হাঁ।

যদি মাসুদ ইরানীর আসল পরিচয় জেনে তুমি তাকে উপেক্ষা করো বা বিয়ে করতে রাজী না হও?

না। আমি তাকে ভালবাসি। তার আসল পরিচয় আমাকে আমার সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে সক্ষম হবে না।

বেশ, তোমার সংকল্প অটুট থাক। বিখ্যাত পিয়ানোবাদক মাসুদ ইরানী আর কেহ নয়— তোমাদের পরম আত্মীয় মিঃ আর্থার।

বিস্ময়ে চমকে উঠলো শ্যালন, অবাক হয়ে তাকালো সে মাসুদ ইরানীর মুখের দিকে।

মাসুদ ইরানীবেশি আর্থার তখন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে।
কারো মুখে কথা নেই।
গীর্জার ফাদার সম্মুখে দণ্ডায়মান।
বনহুর ওপাশে রক্ষিত টেবিল থেকে দু'গাছা ফুলের মালা নিয়ে দু'জনার হাতে দেয়।
ফাদার বলেন— শুভ মুহূর্ত চলে যাচ্ছে। বিয়ের মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকেন তিনি।
শ্যালন স্থবিরের মত মালাটা পরিয়ে দেয় মাসুদ ইরানীবেশি আর্থারের গলায়।
আর্থার তার হস্তস্থিত মালাটা শ্যালনের কণ্ঠে দেয়।
ফাদার ইংরেজিতে উচ্চারণ করেন তাদের বিয়ের মন্ত্র।
বিয়ে হয়ে যায়।
বনহুর আনন্দের হাসি হাসে!

❑

বনহুর আজ বন্ধনহীন।
মুক্তির নিশ্বাস ফেলেছে সে। শ্যালন আর তাকে বিরক্ত করতে আসবে না কোনোদিন। কথাটা ভাবতেই বনহুরের মনটা যেন কেমন মোচড় দিয়ে উঠলো। আজ সমস্ত দিনটা সে এতোটুকু স্বস্তি পায়নি— যতই শ্যালনের কথা মন থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছে, ততই যেন গভীরভাবে দাগ কেটে বসেছে ওকে। সিগারেটের পর সিগারেট নিঃশেষ করে চললো সে।
বনহুর হাতঘড়ির দিকে তাকালো।
রাত দু'টো বেজে বিশ মিনিট হয়েছে। আসন ত্যাগ করে উঠতে পড়লো। আজ তাকে জিজ্ঞাসা করবার কেউ নেই! এতোবড় বাড়িখানায় শুধু বনহুর একা— নিঃসঙ্গ!
চাকর-বাকরগণ তাদের নিজ নিজ বিশ্রামকক্ষে গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন!
বনহুর তার ড্রেসিং কক্ষে প্রবেশ করে।
তারপর যখন বেরিয়ে আসে তখন তাকে ঠিক একটি শ্রমিকের বেশে দেখা যায়। কাপড়ের নীচে ছোট্ট আণ্ডারওয়ারের মধ্যে লুকিয়ে নিলো একগাছা সিল্ক-কর্ড আর একটি রিভলভার। গাড়িখানা তার গাড়ি-বারান্দায় অপেক্ষা করছিলো, ড্রাইভিং আসনে উঠে বসে ষ্টার্ট দিলো। একেবারে সোজা শ্যামবাজার অভিমুখে রওয়ানা দিলো সে।
কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্যামবাজার এসে পড়লো বনহুর। সে পূর্বের গলি, যে গলির মধ্যে একদিন ড্রাইভারের বেশে অভয়কর বিশ্বাসের গাড়ি নিয়ে সে এসেছিলো। গাড়িখানা একটা এঁদো পঁচা গলির মধ্যে ব্যাক্ করে রেখে

নেমে এলো বনহুর। ঠিক সে দরজায় এসে দাঁড়ালো, যে দরজা খুলে একদিন বেরিয়ে এসেছিলো গুণ্ডাদের সর্দার মহাতক সিং।

বনহুরের মাথায় গামছা বাঁধা। কাপড়টা ছেঁড়া এবং ময়লা, হাঁটুর উপর উঁচু করে পরা রয়েছে! গায়ে একটা ময়লা ফতুয়া জামা। গলায় কালো ফিতায় গাঁথা মাদুলী। কেউ তাকে কুলী না বলে উপায় নেই।

দরজায় দাঁড়িয়ে টোকা দিলো বনহুর। একবার, দু'বার তিনবার । দরজা খুলে গেলো, একটি ভয়ঙ্কর মুখ বেরিয়ে এলো।

বনহুর লম্বা একটা সেলাম ঠুকে বললো—আমি বালিগঞ্জ থেকে আসছি, কথা আছে সর্দারের সঙ্গে।

ভয়ঙ্কর চেহারার লোকটা বনহুরকে সঙ্গে যাওয়ার জন্য ইংগিত করলো!

বনহুর অনুসরণ করলো তাকে।

বাড়িটা সম্মুখ থেকে ভাংগাচোরা মনে হলেও ভিতরে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। ঠিক একটি হোটেলের অভ্যন্তরের মত! চারদিকে নিপুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অগ্রসর হলো বনহুর। পরপর কয়েকখানা ঘর পেরিয়ে ওদিকে মাঝখানের একটা ঘরে বেশ কিছুসংখ্যক চেয়ার-টেবিল পাতা রয়েছে। ঘরটা খুব লম্বা এবং প্রশস্ত। প্রত্যেকটা চেয়ার টেবিলে চার-পাঁচজন গুণ্ড ধরনের লোক বসে হাসি-গল্প করছে আর বোতল বোতল মদ পান করছে। কেউ কেউ তাস নিয়ে জুয়া খেলতে বসেছে।

ওদিকের একটা টেবিলে বসে আছে সেদিনের সে গুণ্ডা সর্দার মহাতক সিং। সে একটা গোটা বোতল মুখের কাছে তুলে নিয়ে পান করছিলো।

তার লোকের সঙ্গে একটি অপরিচিত লোককে দেখে মহাতক হাতের বোতলটা নামিয়ে রাখলো। রক্ত রাঙা চোখ দুটো তুলে তাকালো তাদের দিকে।

লোকটা বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো— ইনি আমাদের সর্দার।

বনহুর সেলাম করলো।

মহাতক বললো— কোথা থেকে এসেছিস বেটা?

কণ্ঠে ভীতিভাব এনে বললো কুলীবেশি দস্যু বনহুর— হুজুর বালিগঞ্জ থেকে। ভীম সিং আমাকে পাঠিয়েছে।

ভীম সিং?

হাঁ হুজুর।

বনহুর মনে মনে কিন্তু অবাক না হয়ে পারলো না। সেদিন অভয়কর বিশ্বাসের ড্রাইভারের বেশে এসে মহাতকের কণ্ঠে যে ভাষা সে শুনেছিলো সে নিখুঁত হিন্দি ভাষা— বাংলা যেন বলতেই জানেনা আর কি। আর আজ সুন্দর বাংলা বলছে, কোনো ভুল নেই তার কথায়।

মহাতক বললো আবার— ভীম সিং-এর খবর কি?

হুজুর, ভীম সিং এখন আগের চেয়ে অনেক ভাল। সে আমাকে পাঠিয়েছে।

হাঁ, এবার মনে পড়েছে— তার কাছে আমার জরুরী একটা কাজ ছিলো। তুমি বসো, আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। মহাতক কাগজ আর কলম নিয়ে বসলো।

চিঠিখানা লিখা শেষ করে হাতে দিলো মহাতক কুলীবেশি দস্যু বনহুরের।

বনহুর চিঠি হাতে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলো।

মহাতক ডাকলো— কালকেই সে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে বলো!

আজ্ঞে বলবো। বেরিয়ে যায় কুলীবেশি বনহুর।

বনহুর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে এলো গলিপথ থেকে। বেশ কিছু দূর চলার পর একটা লাইট পোষ্টের পাশে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে বের করলো মহাতকের দেয়া চিঠিখানা। মেলে ধরলো চোখের সামনে। চিঠিতে লিখা আছে— সংক্ষিপ্ত কয়েকটি অক্ষর—

"ভীম— মাং--বং ---একং---হাং---ব
সিং---মিং--- পাং --- খিং--- পুং--- ডং--
জাং--- থাং--- বেং --- আঃ--- সেং--
টাং--- মিং--- দিং-- বোং--

তোমার মহা-

বনহুর চিঠিখানা নিয়ে ফিরে এলো নিজের বাসায়। কুলীর ড্রেস পাল্টে এসে বসলো আলোর সামনে। সিগারেট কেট বের করে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে নিলো, তারপর মহাতকের দেয়া চিঠিখানা বারবার পড়তে লাগলো। কিছু বোঝা যাচ্ছে না, সংকেতপূর্ণ শব্দ লিখেছে মহাতক ভীম সিং-এর কাছে। অদ্ভুত শব্দ ----আপন মনে হাসলো বনহুর।

এবার সে একটা কাগজ আর কলম তুলে নিলো। তারপর লিখে চললো, কতবার যে আবোল-তাবোল কত কি লিখলো! কতবার ছিঁড়ে টুকরো করে ফেললো তার ইয়ত্তা নেই।

বনহুর আবার মনোযোগ দিলো মহাতকের চিঠিখানায়।

বনহুর লিখলো, বহুবার ছিঁড়লো— হঠাৎ একবার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো তার মুখমণ্ডল! আপন মনেই বলে উঠলো, পেয়েছি— পেয়েছি এবার। লেখা কাগজখানার পাশে মেলে ধরলো মহাতকের দেয়া সাংকেতিক চিঠিখানা মিলিয়ে পড়তে লাগলো। প্রথম মহাতকের সাংকেতিক চিঠিখানা পড়ে নিলো সে—

ভীম্---মাং--- বং--- একং--- হাং--- ব --সিং
মিং--- পাং-- খিং-- পুং-- ডং--জাং--
থাং--- বেং-- আঃ---সেং--- টাং--- মিং --
দিং--- বোং---

ঐ চিঠিখানার সঙ্গে মিলিয়ে এবার পড়তে লাগলো নিজের লিখাটা —

ভীম সিং, মালিককে-—বলো—এক —হাজার

বস্তা— সিমেন্ট —পাঠাতে —খিদির—পুর— ডকে
জাহাজ—থাকবে — আমি —সেখানে গিয়ে—টাকা—
মিটিয়ে —দিবো---

উল্লসিত ভাবে হেসে উঠলো বনহুর, তারপর কাগজ দু'খানা ছিঁড়ে ফেললো টুকরা টুকরা করে।

❑

খিদিরপুর ডক।

হাজার বস্তা সিমেন্ট ভর্তি হয়েছে জাহাজে। অল্পক্ষণ পরই জাহাজ খিদির পুর ডক ছেড়ে রওয়ানা দেবে।

রাত তখন বারোটা বেজে গেছে।

ডকের খালাসীরা এবার সারাদিনের পরিশ্রমের পর বিশ্রাম নিতে চলে গেছে। দু'চারজন এখনও ঘোরাফেরা করছে বটে কিন্তু তারা কোনো মাল বহনের আশায় নয়, কোনো পরিচিত বন্ধুর খোঁজে হয়তো এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। হয়তো বা একটা বিড়ির প্রয়োজন হয়েছে বা এক খিলি পান খাবে ওর পয়সায়।

জাহাজের সিঁড়ি এখনও উঠিয়ে নেওয়া হয়নি। ডেকের রেলিং— এর পাশে দু'টো লোক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিম্নস্বরে কিছু কথাবার্তা বলছিলো।

অদূরে ডেকের অন্ধকারে আর একটি কালোমূর্তি দাঁড়িয়ে ছিলো রেলিং-এ ঠেশ দিয়ে। সমস্ত শরীর কালো ড্রেসে আবৃত। মাথায় জমকালো ক্যাপ। অন্ধকারে তাকে মোটেই দেখা যাচ্ছিলো না।

ডকে দাঁড়িয়ে যারা এতোক্ষণ কথাবার্তা বলছিলো তারা এবার পাশের ক্যাবিনে প্রবেশ করলো। ক্যাবিনের দরজাটা টেনে দিলো প্রথম ব্যক্তি। ক্যাবিনের আলোতে দেখা গেলো— ওরা দু'জনের একজন মহাতক সিং, দ্বিতীয় জন অন্য কেহ নয়— স্বয়ং অভয়কর বিশ্বাস। বেশ কিছুদিন তিনি নীরব থাকার পর আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছেন। ভুলে গেছেন কালোমূর্তির শাসনবাণী। আবার অভয়কর বিশ্বাস শুরু করেছেন কালোবাজারী। গোপনে তিনি দেশ—বিদেশে ব্ল্যাকে সিমেন্ট চালান দিয়ে যাচ্ছেন।

মহাতকের নিকট হতে আজকের সিমেন্টের টাকা গুণে নিলেন অভয়কর বিশ্বাস।

জাহাজ ছাড়ার ভোঁ বেজে উঠেছে।

ব্যাগ হস্তে উঠে দাঁড়ান অভয়কর বিশ্বাস।

ঠিক্ সে মুহূর্তে ক্যাবিনে প্রবেশ করে কালো মূর্তি— হস্তে উদ্যত রিভলভার। চোখে কালো চশমা।

মুহূর্তের জন্য চমকে উঠলো উভয়ে। কিন্তু মহাতক সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিলো, আগুনের ভাটার মত জ্বলে উঠলো ওর চোখ দুটো! দাঁতে দাঁত পিষে বললো— কে তুই?

কালোমূর্তি অন্য কেউ নয়— স্বয়ং দস্যু বনহুর। কালো চশমার আড়ালে তার চোখ দুটো দিয়েও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হতে লাগলো। কঠিন কণ্ঠে বললো সে—খবরদার নড়বে না!

মহাতকের নিশ্বাস ফোঁস ফোঁস করে বইছে, রাগে ফুলে উঠেছে ওর দেহের মাংসপেশীগুলো। গোঁফ দুটো সজারু কাঁটার মত খাড়া হয়ে উঠেছে। কলকাতার সেরা গুণ্ডা সে। সমস্ত গুণ্ডাদলের সর্দার মহাতক— আর সে কি না ভয় পাবে সামান্য এক কালোমূর্তি দেখে। এতোক্ষণ ঝাপিয়ে পড়তো সে কালো মূর্তির উপর। কিন্তু ওর হস্তের আগ্নেয় অস্ত্রটার জন্যই সে অগ্রসর হতে দ্বিধা বোধ করছিলো। কিন্তু সে সুযোগ খুঁজছিলো।

বনহুর রিভলভার ঠিক রেখে বাম হাতটা বাড়িয়ে দেয় অভয়কর বিশ্বাসের দিকে— ব্যাগ দাও।

অভয়কর আর মহাতক দৃষ্টি বিনিময় করেন।

ব্যাগটা যেমন বাড়িয়ে দিতে যান অভয়কর বিশ্বাস। অমনি মহাতক সিং ঝাপিয়ে পড়ে কালোমূর্তির উপর। কিন্তু ঠিক্ সে মুহূর্তে কালোমূর্তির হস্তের রিভলভার গর্জে উঠলো।

একটা তীব্র আর্তনাদ করে হুমড়ি খেয়ে ক্যাবিনের মেঝেতে পড়ে গেলো মহাতক সিং।

বনহুর দ্রুত হস্তে অভয়কর বিশ্বাসের হাত থেকে টাকার ব্যাগটা এক ঝটকায় কেড়ে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

ততক্ষণে ছুটে আসে আরও অনেকে।

মহাতকের রক্তাক্ত দেহটাকে মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে চীৎকার করে উঠে সবাই, খুন ---খুন--- খুন--

জাহাজ সবেমাত্র তখন বন্দর ত্যাগ করতে শুরু করেছে।

কিন্তু বন্দর ত্যাগ করা আর হলো না, সিমেন্টভর্তি জাহাজখানা আবার নোঙ্গর করতে বাধ্য হলো!

এখানে যখন মহাতকের লাশ নিয়ে মহা হুলস্থূল পড়েছে, অভয়কর বিশ্বাস ক্যাবিনের দেয়ালে মাথা ঠুকে বিলাপ করে চলেছেন— তাঁর লক্ষ লক্ষ টাকা ছিলো ঐ ব্যাগটার মধ্যে। কালোমূর্তি শুধু মহাতক সিংকে খুন করেই উধাও হয়নি, সর্বস্ব নিয়ে গেছে অভয়কর বিশ্বাসের।

বনহুর তখন তার গাড়ি নিয়ে উল্কা বেগে ছুটে চলেছে সোজা খিদিরপুর থানা অভিমুখে। ইতিমধ্যে সে দেহের কালো ড্রেস পাল্টে নিয়ে স্বাভাবিক এক ভদ্রলোকের ড্রেসে সজ্জিত হয়ে নিয়েছে। টাকার ব্যাগ আর রিভলভারটা সে লুকিয়ে রেখেছে ড্রাইভিং আসনের নীচে। কেউ তাকে দেখলে বুঝতে

পারবে না— একটু পূর্বেই সে একজনকে নিহত করে লক্ষ টাকা নিয়ে পালিয়েছে।

সে জাহাজ থেকে যখন ডকে নেমে আসে তখন তার গাড়িটা ডকের বাইরে একটা পানির টাঙ্কির নীচে দাঁড়িয়ে ছিলো। জায়গাটা অত্যন্ত নির্জন এবং অন্ধকার। বনহুর এখানেই তার ড্রেস দ্রুত পাল্টে নিতে সক্ষম হয়েছিলো।

বনহুর যখন খিদিরপুর পুলিশ অফিসে এসে পৌছলো তখন খিদিরপুর থাকা অফিসার একটা কেস থেকে সবেমাত্র ফিরে এসেছেন। চেয়ারে বসে কেবলমাত্র একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করবেন ঠিক সে মুহূর্তে বনহুর থানার মধ্যে প্রবেশ করে ব্যস্ত কণ্ঠে জানালো— স্যার, এক্ষুণি আপনাকে খিদিরপুর ডকে যেতে হবে। একটা মালবাহী জাহাজে এমাত্র খুন হয়েছে!

খুন হয়েছে?

হাঁ স্যার।

আপনি কে?

আমি অভয়কর বিশ্বাসের একজন কর্মচারী। স্যার, শুধু খুন নয়— আমাদের মালিকের প্রায় লক্ষ টাকার বেশি টাকাসহ ব্যাগ নিয়ে হত্যাকারী উধাও হয়েছে।

হত্যাকারী টাকাও নিয়েছে?

হাঁ স্যার। আপনি বিলম্ব করবেন না স্যার, এক্ষুণি চলুন।

বনহুর জানে, পুলিশ সন্ধান নিলেই সমস্ত গোপন ব্যাপার ফাঁস হয়ে যাবে। চোরা কারবারের জন্য অভয়কর বিশ্বাসও রেহাই পাবে না। সমস্ত সিমেন্ট আটক হবে পুলিশের হাতে!

নিজের গাড়িতে করেই বনহুর নিয়ে চললো ও-সি এবং কয়েকজন পুলিশকে।

খিদিরপুর ডকে পৌছতে বেশি বিলম্ব হলো না। বনহুর স্বয়ং পুলিশবাহিনী সহ হাজির হলো সিমেন্টভর্তি জাহাজটায়। যে ক্যাবিনে খুন হয়েছিলো সে ক্যাবিনে এসে পৌছলো তারা।

অভয়কর বিশ্বাসের নজর পুলিশে পড়তেই ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন। খুন হোক, অর্থ যাক তবু ক্ষতি নেই, কিন্তু পুলিশকে তার সবচেয়ে বেশি ভয়— বিশেষ করে তার সিমেন্টের জাহাজে। অভয়কর হকচকিয়ে গেলেন।

খিদিরপুর থানার ও সি হেমন্তবাবু যখন লাশ ইনকোয়ারী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তখন সরে পড়লো বনহুর সকলের অজ্ঞাতে। এবার সে ডকের অফিসে এসে রিসিভার তুলে নিলো, তারপর ফোন করলো লালবাজার পুলিশ হেড কোয়ার্টারে। ইন্সপেক্টার রাজেন্দ্রনাথ স্বয়ং ফোন ধরলেন ওপাশে।

বনহুর রাজেন্দ্রের গলা শুনেই চিনতে পারলো, বললো সে ইন্সপেক্টার সাহেব, আপনি এক্ষুণিই পুলিশ সুপার মিঃ বোসকে নিয়ে চলে আসুন।

খিদিরপুর ডকে যে জাহাজটি একটু পূর্বে বন্দর ত্যাগ করতে যাচ্ছিলো সে জাহাজে রহস্যজনক একটি খুন হয়েছে।

মিঃ রাজেন্দ্রের গলা— রহস্যজনক খুন!

বললো— বনহুর— হাঁ রহস্যজনক খুন! আপনি এক্ষুণি পুলিশ ফোর্স নিয়ে চলে আসুন।

গম্ভীর কণ্ঠস্বর ইন্সপেক্টার রাজেন্দ্রের —আপনি কে? কোথা থেকে বলছেন?

বনহুর মৃদু হাসলো— আমি অভয়কর বিশ্বাসের পরম বন্ধু।

ওপাশ থেকে মিঃ রাজেন্দ্রের উভগ্রীব কণ্ঠ —আপনার নাম?

কিন্তু বনহুর তার পূর্বেই রিসিবার রেখে দেয়। বেরিয়ে আসে ডকের অফিস-রুম থেকে। অদূরে তার গাড়ি অপেক্ষা করছিলো, গাড়িতে বসে ষ্টার্ট দেয়।

❑

সোজা বনহুর গাড়ি নিয়ে বস্তির দিকে চলে যায়। অপরিচ্ছন্ন স্যাঁতস্যেঁতে গলির মধ্যে খোলার জীর্ণ-কুঠিগুলো সুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছে। পঁচা দুর্গন্ধভরা নিকৃষ্ট গলিপথ।

বনহুরের গাড়ি এসে থামলো গলির মুখে। গাড়ি থেকে নেমে বস্তির মধ্যে প্রবেশ করলো সে। টাকার ব্যাগটা বের করে নিলো ড্রাইভিং আসনের তলা থেকে।

সমস্ত বস্তি তখন নিদ্রায় ঢলে পড়েছে।

বনহুর সম্মুখের একটি দরজার বেড়া ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করলো। কুঠিরের মিটমিটে আলোতে দেখলো অদূরে মাদুরের উপরে শুয়ে আছে গুটিকয়েক ছেলেমেয়ে আর পাশে একটি অর্ধ বয়স্ক মহিলা। ওপাশে আর একটা ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে অর্ধবয়স্ক এক হাড় জিড়জিড়ে লোক।

বনহুর বেড়ায় টোকা দিয়ে শব্দ করলো।

ধড়মড় করে উঠে বসলো লোকটা, বনহুরকে দেখে আর্তচীৎকার করতে যাচ্ছিলো, বনহুর ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে উঠে— চেঁচাবে না, গলা টিপে মারবো। তারপর ব্যাগ খুলে বের করে টাকার বাণ্ডিল, —এই নাও, স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে আরামে থেকো। কথাটা বলে কয়েকখানা নোট গুঁজে দেয় সে লোকটার হাতের মুঠায়।

লোকটার চোখেমুখে রাজ্যের বিস্ময়! ভয় আর আনন্দ দুটো আভাসই ফুটে উঠেছে তার মুখমণ্ডলে। ভাবছে লোকটা— সে তো স্বপ্ন দেখছেনা?

ততক্ষণে স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের ঘুম ভেংগে গেছে, সবাই তাকাচ্ছে বনহুরের দিকে।

বনহুর বেরিয়ে যায়, প্রতিটি কক্ষে প্রবেশ করে সবাইকে টাকাগুলো বিলিয়ে দেয়। তারপর বেরিয়ে আসে বস্তি থেকে। গঙ্গার তীরে এসে দাঁড়ায় এবার, খালি ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় গঙ্গার বুকে।

গঙ্গার শীতল হাওয়ায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে নিশ্চুপ হয়ে। মনটা আজ বড় হাল্কা মনে হচ্ছে ওর।

বেশ কিছু সময় গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে থাকার পর গাড়িতে চেপে বসলো। গাড়িখানা এবার ছুটে চললো হ্যারিসন রোড ধরে হাওড়া ব্রীজের দিকে।

সমস্ত কলিকাতা নগরী নিস্তব্ধ।

ফুটপাতের আলোগুলো কেমন স্তিমিত মনে হচ্ছে আজ। আকাশে মেঘ জমেছে, বৃষ্টির পূর্ব লক্ষণ। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। গুড় গুড় শব্দে মেঘ ডাকছে।

বনহুর গাড়ি নিয়ে চলেছে।

ঠিক ব্রীজের উপরে গাড়িখানা আসতেই হঠাৎ বনহুর লক্ষ্য করলো—দুটো লোক ব্রীজের উপরে ঝাপটা-ঝাপটি করছে। একটি পুরুষ—অন্যটি নারী তাতে কোনো ভুল নেই। যদিও বেশ দূরে এ ব্যাপারটা চলেছে তবু বনহুর ভালভাবেই দেখতে পাচ্ছে। এবার সে গাড়ির স্পীড় কমিয়ে দিলো। গাড়িখানা থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাত সম্মুখে ব্রীজের এক পাশে এ ধস্তাধস্তি চলেছে, পুরুষটির হাত এড়িয়ে মহিলাটি পালাবার চেষ্টা করছে কিন্তু সক্ষম হচ্ছে না।

বনহুর গাড়ি ব্রেক কষে থামিয়ে ফেললো। স্পষ্ট দেখতে পেলো—ব্রীজের এক পাশে একটি ছোট্ট কার দাঁড়িয়ে আছে। কারটি ঐ ধস্তাধস্তিরত ব্যক্তিদ্বয়ের বলেই মনে হলো।

বনহুর গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো।

ঠিক সে মুহূর্তে মহিলাটি পুরুষ লোকটির হাত থেকে নিজকে বাঁচিয়ে নিয়ে লাফিয়ে পড়লো গঙ্গার জলে।

বনহুর ছুটে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো, একবার লোকটির দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখে নিলো, পরক্ষণেই বনহুর ঝাপিয়ে পড়লো গঙ্গার বুকে।

যেমন করে হোক মহিলাটিকে বাঁচাতেই হবে। কে এ মহিলা, আর পুরুষ লোকটিই বা কে? কিন্তু পুরুষ লোকটি তখন দ্রুত তার গাড়িতে গিয়ে চেপে বসেছে। অল্পক্ষণেই গাড়ি নিয়ে লোকটা অদৃশ্য হলো ব্রীজের ওপাশে।

বনহুর তখন গঙ্গার অথৈ জলে মহিলাটির সন্ধানে হাতড়ে চলেছে।